পল্লীপ্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

পল্লীপ্রকৃতি : রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য -সূচক প্রবন্ধ ভাষণ ও পত্রাদির সংকলন।
শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার সাংবার্ষিক উৎসবোপলক্ষে, রবীন্দ্র-শতপূর্তি বর্ষে প্রথম প্রকাশ : ৬ ফেব্রুয়ারি
১৯৬২ : ২৩ মাঘ ১৩৬৮ : ১৭ মাঘ ১৮৮৩ শক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্ন্‌ওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

৫.১

ভারতবর্ষে পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত হইল। প্রধান রচনাগুলি প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ভাগে প্রাসঙ্গিক বিবিধ রচনার সংগ্রহ; প্রধানত প্রাসঙ্গিক কয়েকখানি চিঠি তৃতীয় ভাগে সংকলিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সূচী-অনুযায়ী, প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম, একবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ ব্যতীত মূল গ্রন্থের অন্য অংশগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থপরিচয়ে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কতকগুলি চিঠিপত্র, রচনা বা রচনাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্তমান রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি বর্ষে 'স্বদেশী সমাজ' নামে এই গ্রন্থের পরিপূরক অন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে; তাহাতে উল্লিখিত নামের বহুখ্যাত প্রবন্ধ এবং সমকালীন অন্যান্য রচনা সংকলিত হইবে।

বিষয়সূচী

পত্রাবলী

গ্রন্থপরিচয়

চিত্রসূচী

তৃতীয় চিত্রখানি শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং মুদ্রিত।

হলকর্ষণ-উৎসবের চিত্র শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু শ্রীনিকেতন-উৎসব-প্রাঙ্গণের একটি দেয়ালে ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে অঙ্কিত করেন— ২৪ জানুয়ারি ১৯৩০ (১০ মাঘ ১৩৩৬) তারিখে অঙ্কন সমাধা হয়। সেই দীর্ঘায়ত চিত্রের একটি অংশ মলাটে, অন্য বিশেষ কয়েকটি অংশ গ্রন্থমধ্যে শিল্পীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

ফিরে চল্ মাটির টানে—

যে মাটি আঁচল পেতে

চেয়ে আছে মুখের পানে।

যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,

হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,

ডাক দিল যে গানে গানে

দিক্ হতে ওই দিগন্তরে

কোল রয়েছে পাতা,

জন্মমরণ তারই হাতের

অলখ সুতোয় গাঁথা।

ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা

সাগর-পানে আত্মহারা রে

প্রাণের বাণী বয়ে আনে।

২৩ ফাল্গুন

১৩২৮

সভাপতির অভিভাষণ

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী

... দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে— প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে— কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক্‌ স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারি দিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চির-দিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোটো ছোটো সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কী কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে— নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না— অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না— পাটের খেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার

খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপে নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্মস্থানে বিষ সঞ্চার হইতে থাকে, সে দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারি দিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট, স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিক দিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখন সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়?

এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো উদ্‌যোগ নাই, কেবলমাত্র দুর্বল জাতির দাবি এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ, সে সভা দেশের রাজ-কর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে ?

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তার-বশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালো বৈ মন্দ হয় না— কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল। ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়োই হউক, তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না ; নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে, গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে ; কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই ; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই ; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতের মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে ; যে-সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন ; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। লোকহিতের

কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র। পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি-তদন্ত -জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর-ঐক্য-মূলক সাহস নাই। তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত। যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ-প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপ্‌থিরিয়া রাজযক্ষ্মা টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্‌স্প্লয়্‌টেশন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া

গিয়াছে। এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীন কালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না, তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ— এগুলি কি আকস্মিক? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে? সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি, সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়, তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল— রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী, যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস-বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্মে সর্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলই দূরে চলিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে আর-একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গলসম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে

দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকল দিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি— আমরা টিঁকিতে পারিব কেমন করিয়া ?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না— আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল শহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ, তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশী উদ্‌যোগটা তো শহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা ?

জগদ্দল পাথর বুকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ পুলিসের বাস্তব মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন ? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন ? স্বদেশী-প্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালির সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাঙলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে এ

কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা— একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না। কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা, পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চপদ লাভ করিয়া এ পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

এ কথা যেন না মনে করি যে, দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধান-কালে সংবাদ পাইলাম, পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, 'তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও

ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর্, 'আমি কলিকাতা হইতে বড়ো কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব।' তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, 'কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিঁকিতেই পারিব না।'

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয়, কিন্তু ক্ষীণ রোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারম্বার ভাবিতে হইয়াছে— আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, 'ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন!' তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন, 'বাপু, অন্যকে দোষ দিব কী, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।'

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্ট্ পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি, স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এ দিকে প্রজার দুর্বলতা-সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস-কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন, তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর-কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে

গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে, তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া?

অবশেষে, বর্তমানকালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন, অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্‌বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানে না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে,

মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয়-যোগ কেবল এক দিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পারো এবং যেখানে পারো এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো ; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো ; এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্‌ভাবিত করো। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না, এমন-কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা— মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, 'দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।'

বাংলাদেশের প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স্‌ যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন, তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ হইতে নানা-ধমনী-যোগে জীবনসঞ্চারের বলে কন্‌গ্রেস দেশের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ মর্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস্‌ করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই—

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি— জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশ্যন। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র 'সমূহ' আজ কিছুতেই টিঁকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয়, কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ওই সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ— নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য— তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব; যে-সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব, তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলা-দেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? নহিলে ব্যক্তিগত

বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব— কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্ক-বিতর্ক বিরোধ— কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো, যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, 'এ সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি।' বলিতে পারিবে, 'আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ— এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্যে বিধৃত, জাতীয় সমাজ, এ আমাদেরই কীর্তি— যে দিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দ-গানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।'

ফাল্গুন ১৩১৪

কর্মযজ্ঞ

হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম-উৎসব করতে হয়; কিন্তু, মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না— তার জন্মের পূর্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয় নি— আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে-সমস্ত পথে চলতে চলতে হবে— কিন্তু যাত্রার আরম্ভে পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই তো সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেছি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেছে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্বল তাই আমরা দুর্বল, এর আর নড়চড় নেই। এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছে। দেশ জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন— তার কারণ এ নয় যে, আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেছে— তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করি নে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কী পরিমাণ কাজ আমাদের সামনে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তার পরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কিরকম সাড়া দিলেন যদি জানতে পারি সেও ভালো। কিন্তু

সব চেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকারগ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মতো পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলছে— না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই। এ আশা তো কোনোমতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখছি— হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখদুর্গতির ডালপালা বাড়ছে, তবু প্রাণের ভিতর আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনোমতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড়ো ক্ষীণ। যে-সব জিনিস নির্জীব তাকে এক মুহূর্তেই ফরমায়েশ-মত ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপরে তো সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরম-দুর্বল-রূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে— সে তো অণু-আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারই মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, ক'জন লোকেরই বা এতে উৎসাহ— এসব কথা বলবার কথা নয়। কেননা, বাইরের আয়োজন ছোটো, অন্তরের আশা বড়ো। আমরা কতবার এরকম সভাসমিতির আয়োজন করেছি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েছি— এ কথাও আলোচ্য নয়; ফিরে ফিরে যে এরকম চেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছে তার মানেই, আমাদের আশা মরতে চায় না— তারও মানে, প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেছে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনোই সত্য নয়; সত্য এই যে, শুভচেষ্টা মরে নি এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে, কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত

করেছেন সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তা তো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তা হলে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বেহিসাবি আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্ছে শক্তি— নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন তাঁকে শ্রদ্ধা করি না ব'লেই তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারছেন না। তাঁর কাছে খাজানা নিয়ে এসো; বলো, 'হুকুম করো তুমি, প্রাণ দেব তোমার কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব।' আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বাইরের পর্বতপ্রমাণ বাধাকে বড়ো করে দেখো না, অন্তরের মধ্যে যদি কণাপরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখো। বিশ্বের সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, আপনাকে বিচিত্ররূপে উদ্ঘাটিত করে সার্থক করে তুলছেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েছেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটোমাত্র ছোটো চোখ দিয়ে লোকলোকান্তরে-উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণধারাকে গ্রহণ করতে পারছি, তেমনি আপন খণ্ডশক্তিকে উন্মীলিত করবামাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে সেই শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বলছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাৎড়ে বেড়াচ্ছে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরছে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারছে না— এর জন্য নালিশ করব না। এই বারম্বার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন্ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্বলতা। আমরা এটা দেখতে পেলাম যে, যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড়ো আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি। তাই মনে কেবল আলোচনা করছি, অন্য দেশ এইরকম করে অমুক বাণিজ্য করে; এইরকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে; অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি, আমাদের তা নেই— এইজন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি; মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে সম্পদ্‌গুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব। কিন্তু জানি না, আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিসগুলো তুলে এনে কী ভয়ংকর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে— তখন তার ভার বইবে কে। বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্তাকে দেখি নি— কেননা নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলতে পারি নি। কর্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে; কর্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি, সেই-

জন্যে এ দেশে যে জিনিসটা গোড়াতেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করি নে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে যাদুকরের গাছের মতো মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোটো হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড়ো আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে, সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হয়, তা হলে এক রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক, তিন রাত্রের মধ্যে সে সমূলেন বিনশ্যতি। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্বে এবং কাঠ-খড় জোগাড়ের গোড়াতেই, এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি পৃথিবীর একার্ধকে ধর্মের আশ্রয় দান করেছেন তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা-কিছু বড়ো ও সার্থক তার যে কত ছোটো জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা জানি নে— অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয় করবে— সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার 'পরে জন্মগ্রহণ করেছে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি; বলছি— 'তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।'

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেছে যে, মানুষের উন্নতিসাধন ভালোবেসে নয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ, যেন কেবলমাত্র পুড়িয়ে-পিটিয়ে কেটে-ছেঁটে জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না। তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্‌গীরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি— আমরা সয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি ; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি ; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন— বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহু-দিনের, বহুযুগের ; আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো। কে করবে? দেশের যৌবন— যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরায় ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এইজন্য কোনো জায়গায় ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মানে প্রকাশ।

চারি দিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ যখন একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় তখনই ব্যক্তিত্ব। সংকীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে? দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল, যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ততাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব; তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে sentimentalism, সেই দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি, যে সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে, যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায় নি, তখন আমরা জেগেছি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্বগগনে দেখা দিয়েছে— ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। মায়ের পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন, তেমনি সৌভাগ্য তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার আলোক অতিথি হয়ে এল তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে,

এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেছেন— ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য ভোগ করছে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন জীর্ণ কন্থার উপরে— আমাদের তিনি ভার দিয়েছেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেছেন, 'অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীরপুত্র সব।' আমরা দরিদ্র ব'লেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা ছোটো নই। আমরা বড়ো, এ কথা হবেই প্রকাশ— নইলে এ সংকট আমাদের সামনে কেন! সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

ফাল্গুন ১৩২১

পল্লীর উন্নতি

হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা— তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্বোধ নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপালদোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্বে পূর্বে দেখেছি। খেতে বললে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুশকিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল, সুতরাং সাহস বেশি ছিল, সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালির ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থপক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদিবা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি-চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড়ো একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বলতে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা

হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিই নে। সত্য কথাও খামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্তর মধ্যে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে হঠাৎ মারতে আসে। যেই, সময় পেলেই, দেখতে পায় সামনে গর্ত আছে, তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকারই নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল, সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনি নে, ক্ষেত্রও চিনি নে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সামলাতে পারি নে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তা হলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এমন কথা বলেন নি যে, 'এই আমাদের কাজ, এসো আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই।' তাঁরা বলেন নি 'কাজ করো', তাঁরা বলেছেন 'প্রার্থনা করো'। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না ক'রে বাইরের প্রতি নির্ভর করো।

তাঁদের দোষ দিতে পারি নে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার

দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইচ্ছা করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখতে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে পথ দিয়ে এসেছি আজ সে পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে ব'লেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে 'আয় বৃষ্টি হেনে'। আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তা হলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখি নি। এক দিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পসলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না। কত বৎসর ধরে কেবল মাত্র চাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হই নি। এমনতর অদ্ভুত অসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক ছাত্র, দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত, তা হলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কিরকম বীভৎস হত— প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কিরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিসও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন

প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা, শাসন করা, এর প্রতি সদ্‌বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্‌ব্যয় হবে না তা নয়, অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারণ, আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা ও ধৈর্য চাই। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা, অমনি তার পর দিনেই কারখানা খুলে বসে সর্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনো রকমের মাল তৈরি করতে পারি নে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরীয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি, তবে দেশের সর্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ, সে অবস্থায় শক্তির কেবলই অপব্যয় হতে থাকবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে সয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ

হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্‌ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানছে তাকে আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্য পথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্যোগের চেহারা দেখছি, আমাদের ফসলের খেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এটি শুভযোগ হয়ে উঠবে।

বস্তুত ফললাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ মাটিতে। এক দিকে মেঘের আয়োজন, এক দিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন সংস্পর্শে, চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠছে। আমাদের বিশেষ করে দেখতে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চ-ভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এই-জন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য জন্মে না। সেইজন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনো রকম বড়ো ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মনে আছে একদা কোনো-এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই-সমস্ত নূতন নূতন কেরানিগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসছে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ্ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই তো গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা, যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে— বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে, সে দিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে-- আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল ব'লে, কিন্তু সেইসঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

পল্লীর উন্নতি

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কে হে, শহুরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কী জান?' আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা ব'লে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মানতে পারি নে। কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানছেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর যাঁরা মানছেন না তাঁরা উদ্যম-সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকল প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই-একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, 'তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না— একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল করো।' এজন্য আমি সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করি নি। কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারি নি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের

প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান ক'রে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মৎলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না— উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণীর অকৃতজ্ঞতা অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে, এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ, নীচের কাছ থেকে সকল প্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবি করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয় নি, কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক, আমি পারি নি তার কারণ আমাতেই বর্তমান, কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে

আমাদের মনে হয় 'আমিই সব করব'। রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম, এতে লাভ আমারই। এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভালো কাজ করব এ দিকে লক্ষ না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে, বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারি নে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বারবার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করে নি। আমি বললুম তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব। তারা বললে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা?

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যেই যখন গ্রামের লোক বললে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' তখন তারা এই কথাই জানত যে, এ ক্ষেত্রে যে মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্ছে সেটা আমারই পারত্রিক ভোজের, অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জ্বলে যাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দু-তিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনছে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-মোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয়, তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বলো, অন্ন বলো, বিদ্যা বলো, স্বাস্থ্য বলো, যে-কোনো অভাব-মোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন-কি, তার একপ্রকার অহংকার থাকে। সেই অহংকার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে ওঠে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠছে, পারলৌকিক বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়েমহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তার পরে দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন শহরে শহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃতী শহরে যায় কাজ করতে, ধনী শহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী শহরে যায় জ্ঞানের চর্চা করতে, রোগী শহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভালো কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা— এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই ক'রে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতা-বৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে, তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে

তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড়ো অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে লোক দেবে এবং যে লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। এক দল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর-এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করে নি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্তে যে ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড়ো ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন, যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ছাড়া তাকে কোনো-মতেই কোনো দয়ায় বা কোনো বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্য সহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।

দুর্বলতা যে কিরকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বললে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে, তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই— কোনো ধনীর

এক পেয়াদা তরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দু-চার জন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর শহরে রটে গেল যে, পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আসছে। বোলপুরে কেউ বা দরজায় স্ক্রু এঁটে দিলে, কেউ বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চার জন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর বাজারে যখন আগুন লাগল তখন কেউ যে কারও সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে, তখন নিজের কলসীটা পর্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসী তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমন-কি গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝি নে এবং এইটে বুঝি নে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তা ঘাট, তার ঘর বাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ প্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে

গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুল আছে। যাঁরা পল্লী-গঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।

বৈশাখ ১৩২২

ভূমিলক্ষ্মী

মাতার কাছে ছোটো ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে যাইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্তত তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনায় অন্য কাজে কেন পাঠাইতে চাও?' সে বলিল, 'হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতেই আমাদের অভাব সচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে।'

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাষী ঠিকমত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিত না। কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল যখন খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হইত সেইখানকার প্রয়োজনেই তাহার খরচ হইত। তখন দেশে রেলের রাস্তা খোলে নাই। গোরুর গাড়ি এবং নৌকার যোগে বেশি পরিমাণ ফসল বেশি দূরে সহজে যাইতে পারিত না। তার পরে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না, সুতরাং তখন মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও

ছিল অল্প। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবি বেশি ছিল না, আর সেই দাবি মিটাইবার আয়োজনও সহজ ছিল। তখন চাষ চলিত, না এমন বিস্তর জমি দেশে পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি—একদিন যে জমি চাষীকে গছাইয়া দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই জমি দাম দিয়া মেলে না। তখন দুর্ভিক্ষের দিনে চাষী আপন জমিজমা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, প্রজা পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাষী প্রাণপণে জমি আঁকড়িয়া থাকে, কেননা জমির দাম বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তাহার একটা মস্ত কারণ এই যে, চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফ়সল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্র-পারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে, অথচ সমস্ত জমি চষিয়াও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

জমিও পড়িয়া রহিল না, ফসলেরও দর বাড়িয়া চলিল, অথচ সম্বৎসর দুইবেলা পেট ভরিবার মতো খাবার জোটে না, আর চাষী ঋণে ডুবিয়া থাকে, ইহার কারণ কী ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন কেন হয়—যখনি দুর্বৎসর আসে অমনি দেখা যায় কাহারও ঘরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নাই। কেন এক ফসল নষ্ট হইলেই আর-এক ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাহাকারের অন্ত থাকে না?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবি সামান্য ছিল, যখন অল্প ফসল পাইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তখনো যে নিয়মে চাষবাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে— প্রয়োজন অনেক

বেশি হইয়াছে, অথচ প্রণালী সমানই আছে। জমি যখন বিস্তর পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বৎসরে চাষ দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ ছিল। এখন কোনো জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাষের প্রণালী যেমন ছিল তেমনই আছে।

চাষের গোরু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গোরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল; রাস্তার পাশে, আলের উপরে, যেটুকু ঘাস জন্মে সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে, গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।

মনে করো কোনো গৃহস্থের যদি, গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেক দিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুরুনদিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাৎনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিম্বা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন? ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরও বেশি বাহির করিতে হইবে।

আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি তাহার বেশি পাইব কী করিয়া? এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার

প্রয়োজন-অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে— নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিম্বা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুকুকে ফসল জোগান দিতাম যে প্রণালীতে, সমস্ত পৃথিবীকে ফসল জোগান দিতে হইলে সে প্রণালী খাটিবে না। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, আগেকার মতন ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্যই খাটানো ভালো, ইহা বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া দুই বেলা দুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো আমাদের চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে বর্তমান কালে সে টিঁকিতে পারিবে না। আমাদের ধনধান্য, ধর্মকর্ম, জ্ঞানধ্যান সমস্তই আজ বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করিতেই হইবে; যাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিয়াছে, অয়মহং ভোঃ! তাহাতে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহ আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডীর মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।

তাই আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার

দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়— সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই-যে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা এই পত্রিকার উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।

আশ্বিন ১৩২৫
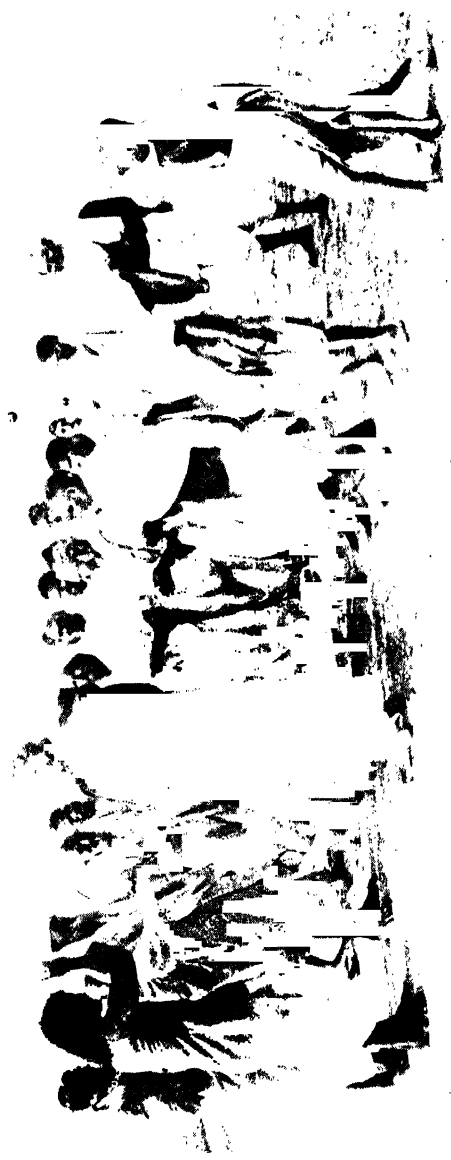
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ । স্থানীয় প্রজা-মণ্ডলীতে
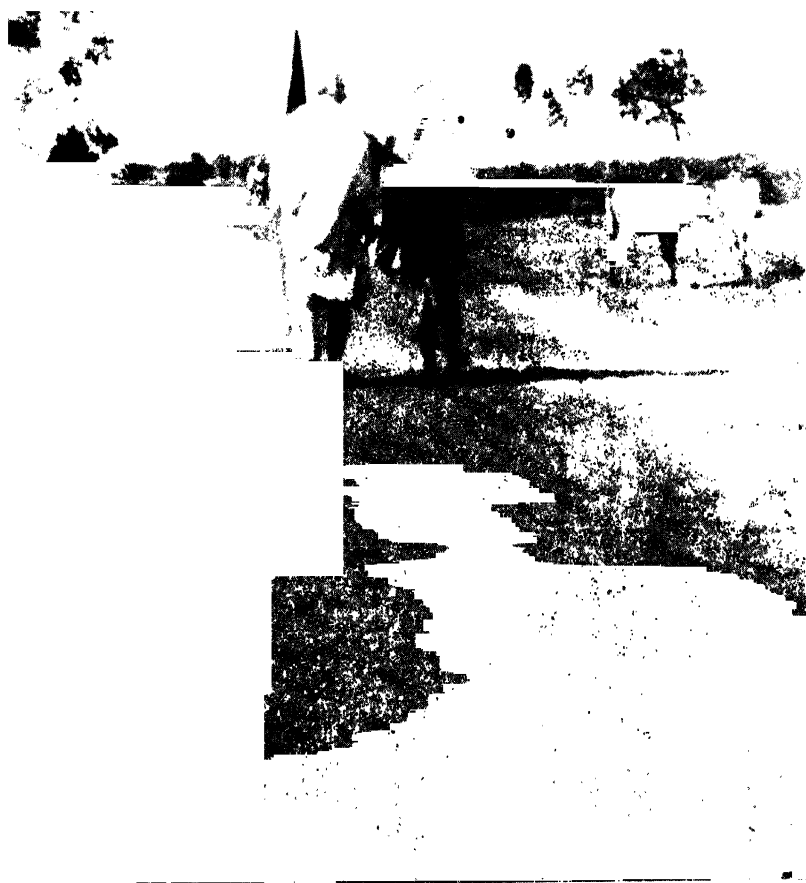
শ্রীনিকেতন

সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কথিত

বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীরণে; হয়তো কোনো গাছ নির্জীব, এই আহ্বানের সে জবাব দিলে না— সে তার পত্রপুষ্প বিকশিত করলে না, সে মূর্ছিত হয়েই রইল। যে গাছের অন্তরে রসের ধারা আছে, বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে যখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনই তো উৎসব।

আমাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিঃশ্বসিত। যেখানে সে বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে একদিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানকে যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলক্ষ করে একটি সৃষ্টির সূচনা হল। কোথায় যে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে না। সূর্যকিরণসম্পাতে পর্বতশিখরে নিশ্চল কঠিন তুষার যেদিন গলে যায়, সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন্ কোন্ দেশকে ফলশালী করে সাগরে গিয়ে পৌঁছবে সেদিন তা কেউ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু গতি যেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেগে আপনার ভাগ্যকে বহন করে চলে। কত বিচিত্র শাখায় যে তার পরিণতি হবে সে তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা যে তার রুদ্ধ শক্তি মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একদা দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন আমরা

কোনো একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলাম, তাই নিয়ে আত্মাভিমানের ছোটো কথাটি আজকের কথা নয়। আমাদের আনন্দ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হবার চেষ্টা জেগেছে ; সেই মিলনসাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আজ তপস্যার দীক্ষাগ্রহণের স্মরণের দিন। আজ মনকে নম্র করো, আপনার মধ্যে যে দীনতা রয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন করো— আনন্দে এবং গৌরবে। আজকে বিচার করে দেখতে হবে, যে কাজের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কী। আমাদের উদ্‌বৃত্তটুকু নিয়ে আমরা দাতাবৃত্তি করতে চাই নি। দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান— বাইরের অপমান তারই আনুষঙ্গিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার শহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে ও চীনে, প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ববোধের স্বতশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আমাদের কোন্ ভাগ্যদোষে সমাজের সেই ব্যাপক ব্যবস্থার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল! রাজশক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন স্ফূর্তিকে চার দিক থেকে নিরস্ত করে দিলে। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে খাদে সহজে সঞ্চরণ করত, ব্যাবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সুবিধা করবার জন্যে তারই মাঝে মাঝে বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। এই বাঁধগুলিই হচ্ছে শহর। এ আমাদের দেশের প্রাণপ্রকৃতির মূলে ঘা দিয়েছে। শহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তীব্রতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাহিরে ঘন দুঃখের ছায়া কিরূপ অন্তহীন। অন্ন নেই, জল

নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আনন্দ নেই, আলোর পর আলো একে একে নিবল। যদি দেখতুম যা হারিয়েছি, শহরে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেলুম, তা হলেও সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু যা পাওয়া গেল সে তো কল-কারখানার জিনিস, আপিস-আদালতের জিনিস, বেচাকেনার জিনিস, সে তো স্বপ্রকাশ প্রাণের জিনিস নয়। তাতে সুবিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেখানে আপনাকে উপলব্ধি করে না— সেখানে যেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীয়ের অভিসারে সে আপন কুল খোয়াতে বসেছে।

এ দুর্গতি কিসে দূর হবে?

ছোটো ছোটো আনুকূল্যের দ্বারা তো হবে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা, সমস্যাকে খণ্ড করে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্‌বোধিত করে। তার থেকে সে যা কিছু ফল পায়, সে ফল তত মূল্যবান নয় যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্মশক্তির উপলব্ধি। এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে সৃষ্টিকর্তা। আমাদের এই আপন সৃষ্টিশক্তির মধ্যে আমরা বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ পাই। তার সঙ্গে সহযোগিতাতেই আমাদের গৌরব, আমাদের কল্যাণ। যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ, সেইখানেই আমাদের যত কিছু দুর্গতি। যেখানে বিশ্বসৃষ্টিতে আমাদের কাজের বিধান নেই, কেবল ভোগের বরাদ্দ, সেইখানে তো আমরা পশু। মানুষ আপন ভাগ্যকে আপনি গড়ে তোলে, সেই তার আপন জগৎ। আত্মকর্তৃত্বের, আত্মসৃষ্টির সেই জগৎ যদি হারিয়ে থাকি, তবে সবই হারিয়েছি। মানুষের মধ্যে

যিনি ঈশ্বর আছেন তাঁর উদ্‌বোধন করতে হবে। আমরা এই গ্রামের দ্বারে এসে সেই দেবতাকে ডাকছি, অন্তরের মধ্যে রুদ্ধদ্বার হয়ে রয়েছেন ব'লে যাঁর পূজা হচ্ছে না। মানুষ জড়ের মতন হয়ে রয়েছে, শুষ্ক কাষ্ঠের মতন, যার ফল নেই, ফুল নেই। মনুষ্যত্বের এত বড়ো অবমাননা তো [illegible]র হতে পারে না।

প্রশ্নকারী বলতে পারেন, তেত্রিশ কোটির তোমরা কী করতে পারো? কিন্তু বিধাতা তো তেত্রিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেন নি? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কী করছ? যে কার্যক্ষেত্র তোমার, সেখানে তুমি নিজেকে সত্য করেছ কি না?' তেত্রিশ কোটির কী করতে পারি, এ প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁরা সত্যকাজের পথকে রুদ্ধ করেন। দুঃসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসাধ্যসাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। যারা আমাদের চার দিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বালতে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন করে চলবে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোটো জায়গায় সার্থক করে তুলি, তা হলে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস কোরো না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হলেও দিগ্‌বিজয়ী। আপনার অন্তরের দীনতাকে দূর করো; তপস্যাকে সার্থক করে তোলো; তা হলে এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে— শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ছায়াদান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পল্লীপ্রকৃতি

মৌমাছি মৌচাক রচনা করলে, তার গোড়াকার কথাটা তাদের অন্নের ব্যবস্থা। ফুলে ফুলে কণা কণা মধু ; কোনো ঋতু উদার, কোনো ঋতু কৃপণ, যে মৌমাছিরা দল বেঁধে সংগ্রহ আর দল বেঁধে সঞ্চয় করতে পারলে, মৌচাকে পত্তন হল তাদের লোকালয়। লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়, ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।

অনেকে ভোগ করবার থেকে যেটা আরম্ভ হল অনেকে ত্যাগ করবার দিকে সেটা গিয়ে গেল। নিজের জন্য কাজ করার চেয়ে সকলের জন্যে কাজ করাটা হয়ে উঠল বড়ো, সকলের প্রাণযাত্রার মধ্যেই নিজের প্রাণের সার্থকতা-বোধ জন্মালো— এরই থেকে বর্তমান কালকে ছাড়িয়ে অনাগত কালকে সত্য বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হল ; যে দান নিজের আয়ু-কালের মধ্যে নিজের কাছে পৌঁছবে না, সে দানেও কৃপণতা রইল না ; লোকালয় বলতে এমন একটি আশ্রয় বোঝালো যেখানে নিজের সঙ্গে পরের, বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রসারিত। এই হল অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ অন্ন যেই বৃহৎ হয়েছে অমনি সে স্থূলভাবে অন্নকে ছাড়িয়ে এমন একটি সত্যকে প্রকাশ করেছে যা মহান। আদিমকালে পশুশিকার করে মানুষ জীবিকানির্বাহ করত, তাতে লোকালয় জমে উঠতে পারে নি। অনিশ্চিত অন্ন-আহরণের চেষ্টায় সকলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন তাদের স্বভাব ছিল হিংস্র, দস্যুবৃত্তি ছিল ব্যবসায়, ব্যবহার ছিল অসামাজিক।

মানুষের অন্নব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও প্রচুর হতে পেরেছে বড়ো বড়ো নদীর কূলে— যেমন নীলনদী, ইয়াংসিকিয়াং, অক্সাস, য়ুফ্রেটিস, গঙ্গা,

যমুনা— সেইখানে জন্মেছে বড়ো বড়ো সভ্যতা, অর্থাৎ লোকালয়বন্ধনের সুব্যবস্থা। পলিমাটিতে ভূমিকর্ষণ করে মানুষ যখন একই জায়গায় বৎসরে বৎসরে প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনি অনেক লোক এক স্থানে স্থায়ীভাবে আবাস পত্তন করতে পারল— তখনি পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরকে আনুকূল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেলে। একত্র মেলবার যে সামাজিক মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্নসংস্থানের সুযোগের দ্বারা সেইটে জোর পেয়ে উঠল। মানুষ ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ পেলে, একত্র সবাই পাত পেড়ে বসল, তখন পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের সন্ধান মিলল, বহুপ্রাণ এক-অন্নের দ্বারা এক প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার করল। তখন দেখতে পেলে পরস্পরের যোগ কেবলমাত্র সুযোগ নয়, তাতে আনন্দ। এই আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিস্বীকার, এমন-কি, মৃত্যুস্বীকারও সম্ভবপর হয়।

পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল-খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেই রূপ দেখে মানুষ কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না; সে উৎসবের আয়োজন করে, সে দেখতে পায় লক্ষ্মীকে যিনি একই কালে সুন্দরী এবং কল্যাণী। ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্যের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্যপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপ রস বর্ণ গন্ধ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রণের সৌহার্দ্যের ডাক। পৃথিবীর অন্ন যেমন সুন্দর, মানুষের সৌহার্দ্য তেমনি সুন্দর। একলা যে অন্ন খাই তাতে আছে পেট ভরানো, পাঁচজনে মিলে যে অন্ন

খাই তাতে আছে আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার যজ্ঞক্ষেত্রে অন্নের থালি হয় সুন্দর, পরিবেষণ হয় সুশোভন, পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।

দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সংকুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েছে মানুষের গ্রাম। মানুষের মধ্যে যা অমৃত তার প্রকাশ হল এই মিলন থেকে— তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মানুষ গভীরভাবে আত্মপরিচয় পেলে, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।

গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উদ্ভব। সেখানে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত ; সেখানে সৈনিকের দুর্গ, বণিকের পণ্যশালা, বিদ্যাদান ও বিদ্যা-অর্জনের উদ্দেশে বহু স্থান থেকে এক স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশ, দূর পৃথিবীর সঙ্গে জানাশোনা দেনা-পাওনার যোগ। সেখানে মাটির বুকের 'পরে জগদ্দল পাথর, জীবিকা সেখানে কঠিন, শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা। সেখানে সকল-মানুষকে হার মানিয়ে একলা-মানুষ বড়ো হতে চাচ্ছে। বাড়াবাড়ি না হলে তারও ফল মন্দ নয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যদি অতিশয় চাপা পড়ে তা হলে ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষ ঘটে না। সমান-মাথা-ওয়ালা ঝোপগুলোর চাপে বনস্পতি বেঁটে হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অত্যাকাঙ্ক্ষা অগ্নিবাষ্পের ঠেলায় জনসঙ্ঘের সাধারণ আশ্রয়ভূমিকে উঁচুর দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, উৎকর্ষের আদর্শ বেড়ে ওঠে, পরস্পরের নকলে ও রেশারেশিতে মানুষের শক্তির চর্চা অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে থাকে, জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রে নবনবোন্মেষ সম্ভবপর হয়, নানা দেশের নানা জাতির চিত্ত-সমবায়ে বিদ্যার আয়তন প্রশস্ত হয়ে ওঠে। শহরে, যেখানে সমাজের চাপ অতিঘনিষ্ঠ নয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুযোগ পায়, মানসশক্তি একটা সাধারণ আদর্শের অনুচ্চ সমতলতা

ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। এই কারণেই বুদ্ধির জড়তা ও সংকীর্ণতা সকল দেশেই সকল কালেই গ্রাম্যতার নামান্তর হয়ে আছে।

শহরে মানুষ আপন কর্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে; তার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহে প্রাণশক্তি যেমন এক দিকে ব্যাপ্ত, তেমনি আবার এক এক জায়গায় তা বিশেষ ও বিচিত্র -ভাবে সংহত। নিম্ন শ্রেণীর জীবদেহে এই মর্মস্থানগুলি সংহত হয়ে ওঠে নি। দেহবিকাশের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ড পাকযন্ত্র বিশেষ বিশেষ দেহক্রিয়ার স্বতন্ত্র যন্ত্র হয়ে উঠল। এইগুলিকে শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শহরগুলি লোকালয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের কেন্দ্র, মানুষের উদ্যম এক এক স্থানে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সংহত হয়ে তাদের সৃষ্টি করেছে। পূর্বকালে ধনসৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন-সাধনে যন্ত্রের হাত ছিল অতি সামান্যই। তখনকার যন্ত্রগুলির সঙ্গে মানুষের শরীর মনের যোগ সর্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্যে তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারত তা ছিল পরিমিত, আর তার মুনফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। সুতরাং তখন পণ্যরচনায় কর্মশক্তির আনন্দটা ছিল প্রধান, কর্মফলের লোভটা তার চেয়ে খুব বড়ো হয়ে ওঠে নি। তাই তখনকার নগরগুলি মানুষের কীর্তির আনন্দরূপ গ্রহণ করতে পারত।

অন্যান্য সকল রিপুর মতোই লোভটা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি। এই-জন্যেই মানুষ তাকে রিপু বলেছে। বাইরে থেকে ডাকাত যেমন লোকালয়ের রিপু, ভিতর থেকে লোভটা তেমনি। যতক্ষণ এই রিপু পরিমিত থাকে ততক্ষণ এতে ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কর্মোদ্যম বাড়িয়ে তোলে, অথচ সমাজনীতিকে সেটা ছাপিয়ে যায় না। কিন্তু লোভের কারণটা যদি অত্যন্ত প্রবল ও তার চরিতার্থতার উপায় অত্যন্ত বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সমাজনীতি আর তাকে সহজে ঠেকিয়ে

রাখতে পারে না। আধুনিক কালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে ক'রেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল ক'রে উঠছে। দেখতে দেখতে চারি দিকে কেবল লড়াই ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। এইরকম অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চ'লে যায়, শহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

আজ গ্রামের আলো নিবল। শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলল— সে আলোয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সংগীত নেই। প্রতি সূর্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্যাস্তে যে আরতির প্রদীপ জ্বলত, সে আজ লুপ্ত, ম্লান। শুধু-যে জলাশয়ের জল শুকোলো তা নয়, হৃদয় শুকোলো। জীবনের আনন্দে মাঠের ফুলের মতো যে-সব নৃত্যগীত আপনি জেগে উঠত তারা জীর্ণ হয়ে ধুলায় মিলিয়ে গেল। প্রাণের ঔদার্য এতকাল আপনিই আপনার সহজ আনন্দের সুন্দর উপকরণ আপনিই সৃষ্টি করেছে— আজ সে গেল বোবা হয়ে, আজ তাকে কলে-তৈরি আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে— যতই নিচ্ছে ততই নিজের সৃষ্টিশক্তি আরও অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে।

বেশি দিনের কথা নয়, নবাবি আমলে দেখা গেছে, তখনকার বড়ো বড়ো আমলা যাঁরা রাজদরবারে রাজধানীতে পুষ্ট, জন্মগ্রামের সমাজ-বন্ধনকে তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁরা অর্জন করেছেন শহরে, ব্যয় করেছেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেছে— নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হয়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে প্রাণের ধারা শহরে চলে যাচ্ছে, গ্রামের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যোগ আর থাকছে না।

আজ ধূমকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজল, মানুষকে দলে দলে তার স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে। মানুষ আবার

ফিরল তার প্রথম আরম্ভের অবস্থায়— সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল ; আপন আপন স্বতন্ত্র ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে লাগল, তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে। গ্রামে একদিন অনেক মানুষ মিলেছিল, সকলে মিলে সংগ্রহ সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্যে। এখন সংখ্যায় তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ একত্র মিলল, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের ভোগের কেন্দ্র নিজে। তাই সমাজের সহজ বিধানের চেয়ে পুলিশের পাহারা কড়া হয়ে উঠল— আত্মীয়তার জায়গায় আইনের জটিলতা বাইরের শিকল পাকা করে তুলছে। নিজেরা প্রত্যেকেই যেখানে নিজের ভোগের কেন্দ্র, সেখানে আমরা হয় পরের দাসত্ব করি নয় নিজের, কিন্তু দুই'ই দাসত্ব। এই কর্মপাশবদ্ধ মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যারা মিলল, অন্তরের ক্ষেত্রে তাদের মিল নেই ব'লে এই-সব পরদাস ও আত্মদাসদের মনে ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রবল ; প্রতিযোগিতার মন্থনদণ্ডে মিথ্যা ও হিংসাকে এরা নানা আকারে কেবলই মথিত করে তুলছে। ধনী দরিদ্রে অন্তত আমাদের দেশে বিচ্ছেদ অতিমাত্র ছিল না— তার একটা কারণ, ধনের সম্মান অন্য সব সম্মানের নীচে ছিল ; আর-একটা কারণ, ধনী আপন ধনের দায়িত্ব স্বীকার করত। অর্থাৎ, ধন তখন অসামাজিক ছিল না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠত। তখন মান অপমান ও ভোগের তারতম্য ধনকে আশ্রয় করে স্পর্ধিত আত্মম্ভরিতার সঙ্গে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করে নি। আজ অন্নব্রহ্ম লোভের অন্ন হয়ে ছোটো হয়ে যেতেই একদিন যা সমাজ বেঁধেছে আজ তাই সমাজ ভাঙছে— রক্তে ভাসাচ্ছে পৃথিবী, দাসত্বে জীর্ণ করছে মানুষের মন। আজ তাই ধন অধনের উৎকট অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্যে চার দিকেই উত্তেজনা।

এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র ক'রে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের দ্বারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবকে যারা বাহন করে তারা এক অসামঞ্জস্য থেকে আর-এক অসামঞ্জস্যে লাফ দিয়ে চলে, তারা সত্যকে ছেঁটে ফেলে সহজ করতে চায়। তারা ভোগকে রাখে তো ত্যাগকে তাড়ায়, ত্যাগকে রাখে তো ভোগকে দেশছাড়া করে— মানবপ্রকৃতিকে পঙ্গু ক'রে তবে তাকে শাসনে আনতে চায়। আমরা এই কথা বলি যে, সত্যকে সমগ্রভাবে না নিতে পারলে মানবস্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়— বঞ্চিত করলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন-কি, ঐ-যে কলের কথা বলছিলুম— তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য করছি ব'লেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অঙ্গ। এ একেবারেই মানুষের জিনিস। হাতকে দিয়ে ডাকাতি করেছি বলে যে তাকে কেটে ফেললে মঙ্গল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। নিজেকে পঙ্গু করে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনোটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।

আদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির কোনো-একটা শক্তিরহস্য যেই সে আবিষ্কার করে, অমনি যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী ক'রে তাকে আপনার ব্যবহারের ক'রে নেয়। এর থেকেই তার সভ্যতায় এক-একটা নূতন পর্যায়ের আরম্ভ। প্রথম যেদিন সে লাঙল তৈরি ক'রে মাটির উর্বরতাশক্তিকে কর্ষণ করতে পারলে, সেদিন তার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড়ো পর্দা উঠে গেল। সেই উন্মীলিত আবরণ কেবল যে তার অন্নশালাকে বৃহৎ ক'রে অবারিত করলে তা নয়— এতদিন তার মনের যে অনেক কক্ষ অন্ধকার ছিল, তার মধ্যে

আলো এনে ফেললে। এই সুযোগে সে নানা দিকেই বড়ো হয়ে উঠল। একদিন পশুচর্ম ছিল মানুষের দেহের আচ্ছাদন— যেদিন চরকায় তাঁতে সে প্রথম কাপড় বুনলে, সেদিন কেবল যে সে সহজে দেহ ঢাকতে পারলে তা নয়, এতে তার শক্তিকে বড়ো ক'রে উদ্‌বোধিত করাতে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হল। তাই শুধু মানুষের দেহ নয়, আজকে দিনের মানুষের মন হচ্ছে কাপড়-পরা মন— মানুষ যে মানবলোক সৃষ্টি করছে কাপড়টা তার একটা বড়ো উপাদান। আজকের দিনে আমাদের দেশে আমরা ন্যাশনাল কাপড়টা খাটো করছি, কিন্তু ও দিকে ন্যাশনাল পতাকাটা বেড়ে চলল। তার মানে কাপড়টা কেবল একটা আচ্ছাদন নয়, ওটা একটা ভাষা। অর্থাৎ কাপড়ে মানুষের মন নিজেকে প্রকাশ করবার একটা নূতন উপাদান পেলে। এ কথা সবাই জানে, পাথরের যুগ থেকে মানুষ যখন লোহার যুগে এল তখন কেবল যে তার বাহুশক্তির বৃদ্ধি হল তা নয়, তার আন্তরিক শক্তি প্রসার পেলে। পশুর চার পায়ের অবস্থা থেকে যেদিন মানুষ দুই হাত দুই পায়ের অবস্থায় এল তখনই এর গোড়া-পত্তন। দুই হাত থাকাতে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের বেড়ে গেছে— এই তার দেহশক্তির বিশেষত্ব থেকে তার মনের শক্তি বিশেষত্ব পেলে। সেইদিন থেকে হাতের সাহায্যেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি ক'রে হাতকেই বহুগুণিত ক'রে চলেছে। তাতে করেই বিশ্বের সঙ্গে তার ব্যবহার কেবলই বেড়ে উঠছে, তার থেকেই তার মনের রুদ্ধদ্বার নানা দিকে খুলে যাচ্ছে। কোনো সন্ন্যাসী যদি বলেন যে, বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহারের শক্তিকে সংকুচিত করতে হবে, তা হলে গোড়ায় মানুষের হাত দুটোকেই অপরাধী করতে হয়। ঘোরতর সন্ন্যাসী ততদূর পর্যন্তই যায়। সে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকে ; বলে, 'সংসারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহারই নেই, আমি মুক্ত।' হাতের শক্তিকে খানিক দূর পর্যন্তই এগোতে

দেব, তার বেশি এগোতে দেব না —এটা হচ্ছে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই ঊর্ধ্ববাহুত্বের বিধান। এত বড়ো শাসনের অধিকার পৃথিবীতে কার আছে? বিশ্বকর্মা মানুষকে যতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসবার জন্যে আহ্বান করেন তাকে ততদূর পর্যন্ত এগোতে দেব না— বিধাতৃদত্ত শক্তিকে পঙ্গু করবার এমন স্পর্ধা কোন্ সমাজবিধাতার মুখে শোভা পায়! শক্তির ব্যবহারের পন্থাই আমরা সমাজকল্যাণের অনুগত করে নিয়মিত করতে পারি, কিন্তু শক্তির প্রকাশের পন্থা আমরা অবরুদ্ধ করতে পারি নে।

মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠে নি, এও সেই একই কারণ।

আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা-অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান্ অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে। এ স্থলে আমাদের এই কথাই বলতে হবে— যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল -বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে— শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই।

মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদ্‌কে ভাণ্ডারজাত করে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই এক যুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধ'রে দিন চালাতে পারব না। আজ আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক ; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক।' মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা।

মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আবাহন ক'রে আনতে পারে নি ব'লেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চার দিকে যা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য। পরাভবের অবসাদে মানুষ নড়তে পারছে না, তাই এত দিকে তার এত অভাব। মানুষ বলছে, 'পারলুম না।' শুষ্ক জলাশয় থেকে, নিষ্ফল ক্ষেত্র থেকে, শ্মশানভূমিতে যে চিতা নিবতে চায় না তার শিখা থেকে কান্না উঠছে, 'পারলুম না, হার মেনেছি।' এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী। আমাদের ফসল-খেতে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটা-কতক সতরঞ্চ বুনিয়েছি— আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। যে বড়ো শক্তিকে আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারি নি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি ; আজকের এই অল্পকিছু সংগ্রহ যা আমাদের সামনে রয়েছে সেই দানবের সঙ্গে লড়াই করবার যথোচিত উপকরণ তা নয়।

পল্লীপ্রকৃতি

পুরাণে পড়েছি, একদিন দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতারা হেরে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা আপনাদের গুরুপুত্রকে দৈত্যগুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিদ্যা দেবলোকে আনাই ছিল তাঁদের সংকল্প। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেন নি যে, 'দানবী বিদ্যাকে আমরা চাই নে।' দানবদের কাছ থেকে বিদ্যা নিয়ে তাঁরা দানবপুরী বানাতে ইচ্ছা করেন নি, সেই বিদ্যা নিয়ে তাঁরা স্বর্গকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হতে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েছে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়— বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।

আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্বদাই শুনতে পাই, য়ুরোপের বিদ্যা আমরা চাই নে, এ বিদ্যায় সয়তানি আছে। এমন কথা আমরা বলব না। বলব না, শক্তি আমাদের মারছে, অতএব অশক্তিই আমাদের শ্রেয়। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, তাকে ত্যাগ করলে মার বাড়ে বৈ কমে না। সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্য আমাদেরকে বিনাশ করে, তখন তার প্রতি অভিমান ক'রে বলা মূঢ়তা যে 'সত্যকে চাই নে'।

উপনিষদ বলেন, যিনি এক তিনি 'বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' —নানা জাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ, অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তা হলেই দানের জিনিস তার নিজের জিনিস হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই-যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিযোগাৎ'— বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিক্‌গামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা

বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন— তারই যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন করে জয় করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক— একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক-না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি ক'রে থাকে; সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য, যে অশক্তি, তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকেরই শেষে আছে— সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি-দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত

বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি— হে আবিঃ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ, আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোদ্যম থেকে, অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন ক'রে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্ছে মানুষের ধর্মসাধনা।

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্‌ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে—মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে, ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্প-কিছুতেই সুখ নেই।

মানুষের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে দুর্গতি, যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না— বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে, ত্যাগের

শক্তিতে, প্রেমের বিস্তারে, কর্মচেষ্টার সাহসে, সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে মহতী বিনষ্টিঃ —সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে, ভূমাকে প্রকাশ। মানুষের ভিতরকার যে নিহিতার্থ, যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলছে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এইজন্যেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে। সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম বলতে চাচ্ছে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগত-ভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত ক'রে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদ্‌কে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ্ সুপ্রতিষ্ঠ করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই— ন ততো বিজুগুপ্সতে— তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ

স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেছে, সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটিমাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে— ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে— সমাজকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে; তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ যমের চর আনাগোনা করছে। আমাদের দেশে তার প্রবেশপথ অন্য দেশের চেয়ে আরও যেন অবারিত। এই দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক অনেক জ্ঞানবিজ্ঞান সুযোগসুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সংকীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন বহমান থাকে তখন সেই স্রোতের দ্বারাই এ পারে ও পারে, এ দেশে ও

দেশে, আনাগোনা-দেনাপাওনার যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন্ এই নদীরই খাত বিষম বিঘ্ন হয়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্য কালের অপথ। বর্তমানে তাই ঘটেছে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিদ্যা লাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তারা যে-সব সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকে, সে-সব হল মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে— তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান-বিশ্বাস আচার-অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ্, না আছে অন্নবস্ত্র। ও দিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতি করে, ডাক্তারি করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে— চারি দিকে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ।

যে স্নায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন-সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, যেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে বলে ওঠেন কিছু করা চাই। কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমনভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের

বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়— সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চার দিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য— অর্থাৎ, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে —চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর-কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই— জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে 'আদিম পাপ'। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃ-ভাষা-গত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। ইংরেজি হোটেওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না এমন কথা বলাও যা আর ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক্ সাধনা হতেই পারবে না এও বলা তাই।

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানি ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য ক'রে তবে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে— ভদ্রলোক ব'লে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর

শিক্ষা বোঝে নি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল। অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্ব-সমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি-না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশ-হীন হয়ে আছে ব'লেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতা-বশত, তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জ্বলত তার এক অংশে অল্প তেল, অপর অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলত, অনেকখানি ছড়াত ধোঁওয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা।

ভদ্রসাধারণ এবং ইতরসাধারণের সম্বন্ধটা এইরকমই ছিল। তাদের মর্যাদা সমান নয়, কিন্তু তবুও তারা উভয়ে একত্র মিলে একই আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েছে এক দিকে, জল গিয়েছে আর-এক দিকে; তেলের দিকে আলোর উপাদান অতি সামান্য, জলের দিকে একেবারেই নেই।

বয়স যখন হল ঘরে এল কেরোসিনের ল্যাম্প বিদেশ থেকে; তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই উদ্দীপনার শক্তি। আলোর উজ্জ্বলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যসমাজের তুলনা করা যেতে পারে; সেখানে এক জাতেরই বিদ্যা ও শক্তি দেশের সকল লোকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে উপরিতল নিম্নতল আছে; সেই উপরি-তলের কাছেই বাতি দীপ্ত হয়ে জ্বলে, নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু সেই ভেদ অনেকটা আকস্মিক; সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে হিসাবে জ্যোতির জাতিভেদ নেই; নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তা হলে উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়; সেই চেষ্টা নিয়তই চলছে।

আর-এক শ্রেণীর বাতি আছে; তাকে বলি বিজলি বাতি। তার মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তার আগাগোড়াই সমান প্রদীপ্ত। তার মধ্যে দীপ্ত-অদীপ্তের ভেদ নেই, এই আলো দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জ্বালাবার উদ্যোগ সব দেশে এখন চলছে না; কিন্তু কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে— এর যন্ত্রটাকে পাকা করে তুলতে হয়তো এখনো অনেক ভাঙচুর করতে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়তো দেউলে হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু পশ্চিম-মহাদেশে এই দিকে একটা ঝোঁক পড়েছে সে কথা আর গোপন করে রাখবার জো নেই। এইটে হচ্ছে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম; এই ধর্মসাধনায়

সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে এই রকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জ্বলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্যে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এই রকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন-কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই— আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলণ্ড্ ফ্রান্স্ জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান; তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়; এমন-কি, যে কামনা, যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে, তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়; কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্স্ এথ্নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের, পাশের গ্রামের লোকের আচারবিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটোলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম-মহাদেশের নানা প্রকার 'মুভ্মেণ্ট্'এর পূর্বাপর ইতিহাস এঁরা

পড়েছেন— আমাদের জনসাধারণদের মধ্যেও নানা 'মুভ্‌মেণ্ট্‌' চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিতসাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই, কেননা তাতে পরীক্ষা-পাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়; ভদ্রসমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য— কিন্তু ওরা ছোটোলোক।

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাবপ্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনো আছে— কিন্তু ওরা ছোটোলোক। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন-কি সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়তো এ-সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের স্মৃতি ব'লেই গণ্য করি নে, কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই।

কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।' তিনি এই ভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী— অর্থাৎ, আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা ব'লে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?

এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানে, সকল

লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, এখানে এই গ্রাম-কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ-উদ্‌বোধনের যজ্ঞ করেছি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এতে কতটুকু কাজই বা হবে। স্বীকার করতেই হবে তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু তাই ব'লে লজ্জা করব না। কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই, কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি-অল্প-টুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্— পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।

ফাল্গুন ১৩৩৭

গ্রামবাসীদের প্রতি

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে কথিত

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম-মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেছি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার— অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে— এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করি নি। তারা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, নানা রকম আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে রয়েছে।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে ব'লে এ কথাটি বলছি মনে কোরো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম-মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করছে সে সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ ব'লে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছে, ঐশ্বর্যের পন্থা বিস্তৃত করে দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু দুঃখ পাপে। কলি এমন কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, তা প্রথমত চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে পাই।

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেছেন— এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ্‌, কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শঙ্কিত হয়ে আছে, কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।

তাঁরা কী স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনো বোধ হয় ভালো করে কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি, কিম্বা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন আপন স্বভাব অনুসারে নানা রকম কারণ কল্পনা করছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কিনা জানি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব করতে পেরেছি ঠিকমত।

পশ্চিমদেশ যে সম্পদ্ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ— হাজার হাজার, বহু শতসহস্র। তার-পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরি করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক্‌ লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে— শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই— কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজধর্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে ব'লে মানুষ যে শক্তি পায় আমি তার কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারি দিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয়, তখন সে সম্বন্ধের বৃহত্ত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে, যেখানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ-সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যাবসার সম্বন্ধ নয়,

কিন্তু সকল রকম স্বার্থের অতীত আত্মীয়সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ আর-সমস্ত থেকে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়।

বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন— যাকে ওঁরা happiness বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়। মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে— এ কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েছে। কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যাবসা-ঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ করে, বাইরের ফল— এত তাতে মুনফা হয়, এত রকম সুযোগসুবিধা মানুষ পায় যে, মানুষের বলবার সাহস থাকে না, এটাই সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি! যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে— তার এত অহংকার! আর সেইসঙ্গে এমন অনেক সুযোগসুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্যযোগে উদ্‌ভূত হয়েছে। এগুলিকে চরম লাভ ব'লে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে ক'রে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস, সে হল মানবসম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্র-সন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।

এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশে অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'— এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয়, তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে। তাদের সুখদুঃখের কি হিসেব আছে। প্রতি দিনের পাওনা গুনে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ— মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ— কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কী হয়েছে না হয়েছে। এক সময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়— প্রভু ছিল, দাস ছিল; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল; ধনী ছিল, নির্ধন ছিল— কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজাপার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানা রকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে

দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও এক পাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানের মাঝখানে যে রাস্তা, যে সেতু, সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখো— পল্লীই তখন সব। শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না; কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা-কিছু সম্পদ্ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা যাত্রা পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব। ধর্মকর্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই ক'রে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়।

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম; ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করি নে। কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ্ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ্ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম-মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে, 'আমি ভোগ করব, আমি বড়ো হব, আমার নাম হবে, আমার মুনফা হবে।' যে তা করছে তার কত বড়ো সম্মান! তার ধনশক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এই রকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে দেখি নি। কিছু না, একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরোল, রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আসছে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে বলে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠল। আমাদের দেশে মহদাশয় যাঁকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণধুলো নেব। মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশসুদ্ধ লোক খেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো করে স্বীকার করেছেন ; আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেন নি ; তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর। ব্যস্, হয়ে গেল, এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বুঝি নে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান, অনেক জ্ঞানী, অনেক ধনী আছে ; কিন্তু আমাদের দেশ দেখবে আত্মদানের ঐশ্বর্য। এ কি কম কথা! এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়। পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ্। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েছি, কোনো রকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে

পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কত দূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই; গ্রামে যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি, গ্রামবাসী, তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর-একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি। কেননা, তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধ্বংসে, উপরের তলায় ফাটল ধরছে— বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তা হলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ-সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তিসম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।

চৈত্র ১৩৩৭

দেশের কাজ

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে পঠিত

আমাদের শাস্ত্রে বলে ছ'টি রিপুর কথা— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তাকেই রিপু বলে, যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে। এমনি করে নিজেকে হারানোই মানুষের সর্বনাশ করে, এই রিপুই জাতির পতন ঘটায়। এই ছ'টি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে তার প্রাণে, নিরুদ্যম করে দেয় তার আত্মকর্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উল্টো হচ্ছে মদ— অহংকারের মত্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি; আর গর্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড়ো করে তোলে। এ জগতে অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে। স্পর্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। আমাদের মরণ কিন্তু উল্টো পথে— আমাদের আচ্ছন্ন করেছে অবসাদের কুয়াশায়।

একটা অবসাদ এসে আমাদের শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এককালে আমরা অনেক কর্ম করেছি, অনেক কীর্তি রেখেছি, সে কথা ইতিহাস জানে। তার পর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল ভারতবাসীর চিত্তে, আমাদের দেহে মনে অসাড়তা এনে দিলে। মনুষ্যত্বের গৌরব যে আমাদের অন্তর্নিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জন্যে যে আমাদের প্রাণপণ করতে হবে, সে আমাদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে আমরা নিজের মরার পথ বাধামুক্ত করেছি, তার পর যাদের

আত্মম্ভরিতা প্রবল, আমাদের মার আসছে তাদেরই হাত দিয়ে। আজ বলতে এসেছি, আত্মাকে অবমানিত করে রাখা আর চলবে না। আমরা বলতে এসেছি যে, আজ আমরা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেম। একদিন সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করে-ছিলেম। তখন জলাশয়ে জল ছিল, মাঠে শস্য ছিল, তখন পুরুষকার ছিল মনে। এখন সমস্ত দূর হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কোনো উপায় নেই এত বড়ো মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাই-চাপা পড়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। এ কথা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে স্বীকার না করি, তবে বুঝব এটাই মোহ। অর্থাৎ, যা নয় তাই মনে করে বসা।

একটা ঘটনা শুনেছি— হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেই রকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় করব, সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেছি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে প্রাণস্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসো, একত্রে কাজ করি।

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণ মামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি॥

এই ঐক্য যাতে স্থাপিত হয়, তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলি-

স্খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব্-কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব— একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনোই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ ব'লেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চ'ড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।

রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী বারোটি গ্রাম একত্র করে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, 'আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের

অসাধ্য নয়।' যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ। দুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েছি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। চৈতন্যের দুটি পন্থা আছে। এক হচ্ছে মহাপুরুষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে দেন। তখন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তখন সকল কাজই সহজ হয়। আবার দুঃখের দিনও শুভদিন। তখন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তখন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উদ্যত হয়ে উঠি। একান্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কী করে আনুকূল্য দাবি করতে হয় অন্য দেশে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ইংলণ্ড্ আজ যখন দৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত তখন সে ঘোষণা করেছে, দেশের লোকে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবে। পথে পথে ঘরে ঘরে এই ঘোষণা যে, দেশজাত পণ্যদ্রব্যই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বহুদিনের বহু-অন্ন-পুষ্ট জাতের মধ্যে যখনই বেকার-সমস্যা উপস্থিত হল তখনই দেশের ধন নিরন্নদের বাঁচাতে লেগেছে। এর থেকে দেখা যায় সেখানে দেশের লোকের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ্ দেশব্যাপী আত্মীয়তা। তাদের উপরে আনুকূল্য রয়েছে সদাজাগ্রত। তাতে মনের মধ্যে ভরসা হয়। আমরা বেকার হয়ে মরছি অথচ কেউ আমাদের খবর নেবে না, এ কোনোমতেই হতে পারে না, এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাদের এত ভরসা। আমাদের ভরসা নেই। মারী, রোগ,

দুর্ভিক্ষ, জাতিকে অবসন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমের সাধনা কৈ, সেবার উদ্যোগ কোথায়। যে বৃহৎ স্বার্থবুদ্ধিতে বড়ো রকম করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে আমাদের কোথায়।

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে— কোমর বেঁধে বলতে চাই, কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত— অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর হয়, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারত, তা হলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে বলতুম না। কিন্তু আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় কখানা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

উপেক্ষিতা পল্লী

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥

এখানে তোমরা, যাহাদের মন বিব্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে এক ভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোন্য মভিহর্ষ্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥

তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি কর।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। এক-গতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বলো।

আজ যে বেদমন্ত্র-পাঠে এই সভার উদ্‌বোধন হল অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা বুঝতে পারি, মানুষের পরস্পর মিলনের জন্যে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীতে কতবার কত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে এবং আবার তাদের বিলয় হল। জ্যোতিষ্কের মতো তারা মিলনের তেজে সংহত হয়ে প্রদীপ্ত

হয়েছিল। প্রকাশ পেয়েছিল নিখিল বিশ্বে, তার পরে আলো এল ক্ষীণ হয়ে; মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাদের পরিচয় মগ্ন হল অন্ধকারে। তাদের বিলুপ্তির কারণ খুঁজলে দেখা যায় ভিতর থেকে এমন কোনো রিপুর আক্রমণ এসেছে যাতে মানুষের সম্বন্ধকে লোভে বা মোহে শিথিল করে দিয়েছে। যে সহজ প্রয়োজনের সীমায় মানুষ সুস্থভাবে সংযতভাবে পরস্পরের যোগে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে, ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা সেই সীমাকে নিরন্তর লঙ্ঘন করবার চেষ্টায় মিলনের বাঁধ ভেঙে দিতে থাকে।

বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন-পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল, এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফলফুল-উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায়—তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা। য়িহুদীদের পুরাণে বেবল্‌'এর জয়স্তম্ভ-রচনার উল্লেখ আছে, সেই স্তম্ভ যতই অতিরিক্ত উপরে চড়ছিল ততই তার উপর লাগছিল নীচে নামাবার নিশ্চিত আকর্ষণ।

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে ভুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার

অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমায় কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা। মানবসভ্যতার প্রধান জীবনীশক্তি তার সামাজিক শ্রেয়োবুদ্ধি, যার প্রেরণায় পরস্পরের জন্যে পরস্পর আপন প্রবৃত্তিকে সংযত করে। যখন লোভের বিষয়টা কোনো কারণে অত্যুগ্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অসাম্য সৃষ্টি করতে থাকে। এই অসাম্যকে ঠেকাতে পারে মানুষের মৈত্রীবোধ, তার শ্রেয়োবুদ্ধি। যে অবস্থায় সেই বুদ্ধি পরাভূত হয়েছে তখন ব্যবস্থা-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা আজ সকল দিকেই প্রবল। বর্তমান সভ্যতা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি ক'রে আপন জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হৃদয়বান মানুষের চেয়ে হিসাব-করা ব্যবস্থাযন্ত্র বেশি প্রাধান্য লাভ করে। একদা যে ধর্মসাধনায় রিপুদমন করে মৈত্রীপ্রচারই সমাজের কল্যাণের মুখ্য উপায় বলে গণ্য হয়েছিল আজ তা পিছনে সরে পড়েছে, আজ এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধি। তাই দেখতে পাই এক দিকে মনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রজাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপর দিকে অন্যোন্যজাতিক শান্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অফ নেশন্‌স্। আমাদের দেশেও এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে; যা-কিছুতে একটা জাতিকে অন্তরে বাহিরে খণ্ড বিখণ্ড করে, যে-সমস্ত যুক্তিহীন মূঢ় সংস্কার মনের শক্তিকে জীর্ণ করে দিয়ে পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে থাকে,

তাকে ধর্মের নামে, সনাতন পবিত্র প্রথার নামে, সযত্নে সমাজের মধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্য-বিধি-দ্বারা, পার্লামেন্টিক শাসনতন্ত্র নাম-ধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়, এমন দুরাশা মনে পোষণ করি— তার প্রধান কারণ, মানুষের আত্মার চেয়ে উপকরণের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। উপকরণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কোঠায় পড়ে, শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম। সেই কারণেই যখন লোভ-রিপুর অতিপ্রাবল্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানাটানিতে মানবসম্বন্ধের আন্তরিক জোড়গুলি খুলে গেছে, তখন বাইরে থেকে জটিল ব্যবস্থার দড়াদড়ি দিয়ে তাকে জুড়ে রাখবার সৃষ্টি চলেছে। সেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক। এ কথা মনে রাখতেই হবে, মানবিক সমস্যা যান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব।

বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় এক দল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে— অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ-উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের

মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিঁকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু নগরে একান্ত কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

আজ য়ুরোপ থেকে রিপুবাহিনী ভেদশক্তি এসে আমাদের দেশে মানুষকে শহরে ও গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। আমাদের পল্লী মগ্ন হয়েছে চিরদুঃখের অন্ধকারে। সেখান থেকে মানুষের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। কৃত্রিম ব্যবস্থায় মানবসমাজের সর্বত্রই এই-যে প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা এনেছে, একদিন মানুষকে এর মূল্য শোধ করতে দেউলে হতে হবে। সেই দিন নিকটে এল। আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনের ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনাপাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায় যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থসঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাব-মোচনের জন্যে লাগছে না। এই-যে গায়ের জোরে দেনাপাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর

একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। এই রকম অবস্থা ছোটো বড়ো নানা কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর সর্বত্রই পীড়া সৃষ্টি ক'রে বিনাশকে আহ্বান করছে। সমাজে যারা আপনার প্রাণকে নিঃশেষিত করে দান করছে প্রতিদানে তারা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না, এই অন্যায় ঋণ চিরদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পারে না।

অন্তত ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনোকিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।

এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে— কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জ'মে। পরীক্ষায়-পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্তে প'ড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা; যদি

এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

অরণ্যদেবতা

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ -উৎসবে কথিত

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারি দিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারি দিকে তাঁর তৃণশস্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন ক'রে। তখনো জীবের আগমন হয় নি ; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি ; সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান ; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারালো ; যে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন ক'রে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারত-বর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর-ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে

গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে— এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।

এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদ্‌কে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন — মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ— হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য,

শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৪৫

অভিভাষণ

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার -উদ্‌বোধন

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথায় আলোচনা এখন থাক্।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজ-বপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না ব'লেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক, অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের স্বভাব অন্য রকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এ দিক -ও দিক করলেই কানে ধ'রে তাকে সায়েস্তা করা হয়। যেখানে

প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে; তাতে সময় লাগে বেশি, কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই

পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে-সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ-প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ— জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়— তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো-একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব

ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রি করব না।' এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি, যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাব-বশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি— তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমত তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত— সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারি দিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে এ'কে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরও লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা-ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় ব'লেই আমরা আশা করি এই-সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সব-শেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ, কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই

দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই ব'লে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তাঁর অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।[১]

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত

আমার যা বলবার ছিল তা অনেকবার বলেছি, কিছু বাকি রাখি নি। তখন শরীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে খর্ব করেছে, এখন আমার কাছে তোমরা বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

আমি এখানে অনেক দিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়— আমার উপস্থিতি ও সঙ্গমাত্র তোমাদের দিতে পারি। প্রথম যখন এই বাড়ি কিনলুম তখন মনে কোনো বিশেষ সংকল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল যে, শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষে শিক্ষা-বিভাগের বরাদ্দ বিদ্যার কিছু বেশি দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই-সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটীর— আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম

বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা-আদায়, জমা-ওয়াশীল—এতে কোনো-কালেই অভ্যস্ত ছিলুম না; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে প'ড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময় আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমন ভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা

সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথ -নির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন ক'রে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে— তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে— মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্ করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, ক'ষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবালো। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘর ভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধ'রে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বললে, 'ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি।' তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব ; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে ; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে ; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত ; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, 'ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।'

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনও থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা

কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। একজন সম্পন্ন লোক গ্রামের পালক ও আশ্রয়; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার, তাঁরই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করেছি। যারা ধনী, ভারতবর্ষের সমাজ তাদের উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে; পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মন্দিরনির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যনীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই-সব কর্তব্য-সম্পাদনেই ছিল তাদের সম্মান; এখনকার মতো খেতাব দেওয়ার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্রে তাদের স্তবগান বেরোত না। লোকে খাতির করে তাদের বাবু বা মশায় বলত, এর চেয়ে বড়ো খেতাব তখন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এই রকমে সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে।' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে, 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে— ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব।'

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্য দিকে এই-সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হলে তাদের ভালো হতে পারে, কিন্তু বর্তমান জীবনের দুঃখদৈন্য থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই মনোবৃত্তি তাদের একান্ত অসহায় করে তুলেছে।

একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুণ্য কাজ ব'লে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারও কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোনো সুখ কোনো আনন্দ নেই তারা

হঠাৎ কোনো বিপদ বা রোগ হলে রক্ষা পায় না। বাইরে থেকে এরা অনেক অত্যাচার অনেক দিন ধরে সহ্য করেছে। জমিদারের নায়েব, পেয়াঁদা, পুলিস, সবাই এদের উপর উৎপাত করেছে, এদের কান মলে দিয়েছে।

এই-সব কথা যখন ভেবে দেখলুম তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কখনও গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস ক'রে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা করে দিতে হবে।

এই রকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম— অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায়-আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায়

রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।' শুনে তারা বললে, খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে? আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তা হলে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর-কিছুই নেই। আমাদের দেশে এক সময় শহরের যুবক ছাত্রেরা গ্রামের উপকার করতে লেগে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোক তাদের উপহাস করত; বলত, 'ঐ রে চার-আনার বাবুরা আসছে!' কী করে তারা এদের উপকার করবে— না জানে তাদের ভাষা, না আছে তাদের মনের সঙ্গে পরিচয়।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এইরকম নানা ভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছুদিন চুপ করে বসে ছিলুম। অ্যাণ্ড্রুজ বললেন, 'বেচে ফেলুন।' আমি মনে ভাবলুম, যখন কিনেছি, তখন তার একটা-কিছু তাৎপর্য আছে — আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন করে হবে, তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোনো শুভলগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তখন অভাব। তার পর, আস্তে আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তি-

নিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হত না। এল্‌ম্‌হার্‌স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।

সব-শেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই— চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

১৩৪৬

হলকর্ষণ-উৎসব

শ্রীনিকেতন-ভিত্তিচিত্রের বিভিন্ন অংশ
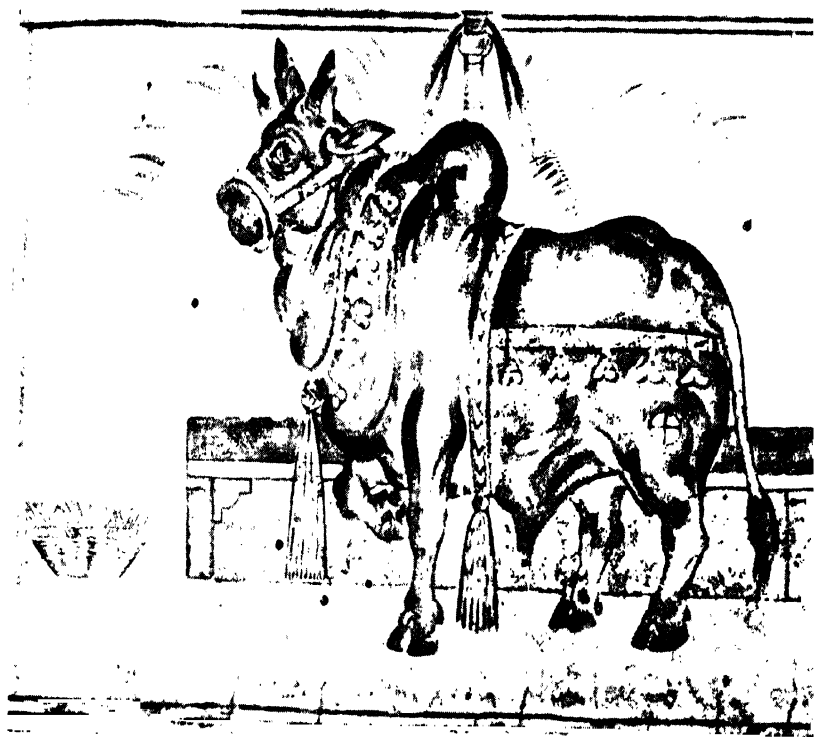
১৩৩৬ শ্রাবণে 'সীতাযজ্ঞ' নামে শ্রীনিকেতনে এই উৎসবের যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ১-সংখ্যক চিত্রে বাম দিকে তাঁহাকে মন্ত্রপাঠ করিতে দেখা যাইতেছে, দক্ষিণে হলকর্ষণ-প্রবর্তক আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সম্মুখেই শ্রীযুক্ত এল্‌মহার্স্ট্‌ দণ্ডায়মান।

শ্রীনিকেতন-উৎসবপ্রাঙ্গণের অন্যতম ভিত্তিগাত্রে ১৩৩৬ মাঘ মাসে (২৪. ১. ১৯৩০) শ্রীনন্দলাল বসু সমুদয় চিত্রের অঙ্কন সমাধা করেন।

হলকর্ষণ

শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ-উৎসবে কথিত

পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্রস্নানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে-সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। আর্য ঔপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন এই-সব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলে মূলে, আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিদ্রোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মানুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংস্রতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তখন অরণ্য মানুষের পথ রোধ করে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল এক দিকে আশ্রয়, অন্য দিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে তারা অগত্যা ছোটো সীমানায় ছোটো ছোটো দল বেঁধে বাস করেছে। এক দল অন্য দলের প্রতি সংশয় ও বিদ্বেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছে। এইরকম মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠান হয়েছে নরঘাতক। মানুষ মানুষের সবচেয়ে নিদারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজও অবসান হয় নি। এই-সব দুষ্প্রবেশ্য বাসস্থান ও পশুচারণভূমির অধিকার হতে পরস্পরকে বঞ্চিত

করবার জন্য তারা ক্রমাগত নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। পৃথিবীতে যে-সব জন্তু টিঁকে আছে তারা স্বজাতিহত্যার দ্বারা এরকম পরস্পর ধ্বংসসাধনের চর্চা করে না।

এই দুর্লঙ্ঘ্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্রশক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তার পর কখনো দৈবক্রমে কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম সহায়-আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজও নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজও আগুন নানা মূর্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।

তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহার্যের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেইসঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন ক'রে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান

করেছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার একটা বড়ো যুগ। সেই দিন সখ্যধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল। তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফললাভের কামনায়। ধনসম্পদ্ ও শত্রুজয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শক্তি কল্পনা ক'রে তারই সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠান তখন গৌরব পেত। কিন্তু যেহেতু এর লক্ষ্য ছিল বাহ্য ফললাভ, এইজন্যে এর মধ্যে বিষয়বুদ্ধিই ছিল মুখ্য ; প্রতিযোগিতার সংকীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ ঐক্যবুদ্ধি এর মধ্যে মুক্তি পেত না।

তার পরে এল এক যুগ, তাঁকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে— আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান্ ব'লে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণরেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

যে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল, তাদের শক্তিকে পরাভূত ক'রে তাদের হাত থেকে এই নূতন বিদ্যাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে, বিস্তর প্রয়াস করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের

একাধিপত্য অরণ্যকে হঠিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন ক'রে। তাতে তাঁর বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব ক'রে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান -কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।

আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।

কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরও দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষায় মানুষকে মানুষ মারত, কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘ যুগের ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর-এক তীর অধিকার করে থাকত। আজ

যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শতসংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা— সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ্, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেষণ করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট— যা এত বীভৎসরকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জ ভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।

১২ ভাদ্র ১৩৪৬

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত

এক সময়ে আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুকাল এক পল্লীতে এক চাষী গৃহস্থের ঘরে বাস করবার। আমি শহরবাসী হলেও সেখানকার পল্লীতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলণ্ডের পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসন্তুষ্ট; গ্রামের ভিতর তাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পুষ্টি নেই, তারা কবে লণ্ডনে যাবে এইজন্য দিন-রাত্রি তাদের উদ্‌বেগ। জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম—য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আয়োজন, শিক্ষা, আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা সংহত বড়ো বড়ো শহরে, এইজন্য শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই-যে ভাগ তা প্রধানত পরিমাণগত, শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে, কোনো বিরোধ নেই; যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই

বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে— শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈদ্য-কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, একটা বড়ো ইমারতের মধ্যে বদ্ধ ক'রে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতি-সম্পদ্ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে— পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এ দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবেন না ব'লে পল্লীর উপকার করতে লেগেছিলেন। তারা পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি, পল্লীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ ক'রে গ্রহণ করতে পারে নি। কী করে মিলবে।

মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয় নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহর-বাসীদের থেকে পৃথক্ করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয় নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গ'ড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পংক্তিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেষণের পাতা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে-যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিভেদ এ'কে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান, কী পল্লী কী নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে— সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনোরকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে। মন অহংকৃত হয় ; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে।' এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন-সব বিষয়ে মুখস্থ-করা উপদেশ দিতে আসেন হয়তো যে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চেয়ে ভালোই জানে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে শিলাইদহে আলুর চাষ বিস্তৃত ভাবে প্রচলন করব। আমার প্রস্তাব শুনে কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ বললেন

যে, আমার নির্দিষ্ট জমিতে আলুর চাষ করতে হলে এক-শো মণ সার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি কৃষিবিভাগের প্রকাণ্ড তালিকা -অনুসারে কাজ করলুম, ফসলও ফলল, কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনোই সামঞ্জস্য রইল না। এ-সব দেখে আমার এক চাষী প্রজা বললে, 'আমার 'পরে ভার দিন্ বাবু!' সে কৃষিবিভাগের তালিকাকে অবজ্ঞা ক'রেও প্রচুর ফসল ফলিয়ে আমাকে লজ্জিত করলে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ, বড়ো উদ্দেশ্য আছে, তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

অভিভাষণ

বিশ্বভারতী সম্মিলনী

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তামহাশয় বলেছেন যে আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা-কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মতো। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ ক'রে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কত দিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ্ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর-একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মতো বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পক্ষে এই-সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য সে কথা মানি; তবুও এ কথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার প্রাণময়

সত্তার উদ্‌ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড়ো-একটা দেখতে পাই নে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বেশি বাকি নেই।

বক্তামহাশয় বলেছেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জনতাবহুল শহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তাতে করে পূর্বে যে মাটিতে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত অথচ তা দরিদ্র হত না, সে মাটি শহুরে মানুষদের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতাগুলির ক্রমে ক্রমে পতন হতে লাগল। অবশ্য আধুনিককালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে শহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও অন্য জায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানি হচ্ছে। এমনি করে খাওয়া দাওয়া সচ্ছন্দে চলছে কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে মানুষকে নিশ্চয়ই একদিন কোনো-খানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র-আবর্তনের কথা বলা হয়েছে তেমনি মনেরও চক্র-আবর্তন আছে, সেটাকেও অব্যাহত রাখতে হবে সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান, তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা কত ত্যাগ কত তপস্যায় তৈরি, কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে

তা হলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয়; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান্ প্রাণপ্রদ হতে পারে না, চিত্তশক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয় তবে তা নির্জীব হয়ে যাবে।

বক্তামহাশয় বলেছেন যে ধানের খড় গাড়ি-বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছে, আর তাতে করে কৃষকের ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং শহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই শহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লীসমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমি দেখেছি সেখানে কী নিরানন্দ বিরাজ করছে। সেখানে যাত্রা কীর্তন রামায়ণগান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে-লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্য দিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রাণবান্ হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্য যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ-আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ, তাদের দ্বারাই চিত্তক্ষেত্র উর্বর হয়। অথচ শহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। শহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তাবন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি

কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তাঁরা বলেন যে সেখানে খাওয়া দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মতো খোরাক দুষ্প্রাপ্য, অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দশার কথা কেউ ভালো করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কী ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম এমন বিকৃত বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে-সব কথা খুলে বলা যায় না।

এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব আজকার বক্তৃতায় প্রশ্ন করেছেন যে প্রাণরক্ষার উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে। একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে গ্রামে যারা মদ খায় তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে, দরিদ্র লোকদের মদ খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। তাদের অবসাদ আসে— তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায় তাই ভিজিয়ে দুপুর বারোটা-একটার সময়ে খায়, তার পর খিদে নিয়ে বাড়ি ফেরে। যখন দেহপ্রাণে অবসাদ আসে তখন তা প্রচুর ও ভালো খাদ্যে দূর হতে পারে, কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাবপূরণ হয় না বলে তারা তিন-চার পয়সার ধেনো মদ খায়, তাতে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তারা নিজেদের রাজা-বাদশার মতো মনে করে সন্তুষ্ট হয়— তার পর তারা বাড়ি যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে ; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা-পার্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে, জবরদস্তি করে, ধর্ম-উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার দুর্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।

অপর দিকে আমরা শহরে অনুরূপ মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্পপরিসরের মধ্যে উন্মাদনার আশ্রয়ে কর্তব্য-বুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষায় লেখায় বা অন্য আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। তাই ক্ষুব্ধ কর্তব্য-বুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্য আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই— আর আমার মতো যারা কাব্যরচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না, সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা হল

না। তাই হাড়ি ডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে আর আমাদেরও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে জানি তারা নন্-কো-অপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যতদিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ততদিন কাজ চলেছিল, তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়িডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন। পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকালসাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেছেন। এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধির কোনোরূপ খাদ্য তো চাই, সেই খাদ্য প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে তা হলে কাজেই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতে হয়।

আজকাল আমরা সমাজের তিন স্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি— সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশান্ত করবার মতো মদ। হাড়িডোমদের মধ্যে একরকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর-একরকম মদ, আর শহরের শিক্ষিতসাধারণের মধ্যেও একপ্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েছে।

১৩২৯

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ

আ্যান্টি-ম্যালেরিয়া-সোসাইটিতে কথিত

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের এই কাজ উপলক্ষে কী করে মিলন হল একটু বলে রাখি। আমি নিজে অবশ্য ডাক্তার নই, এবং ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে আমার মতের কোনো মূল্য নেই। আপনারা সকলে জানেন আমাদের যে 'বিশ্বভারতী' বলে একটা অনুষ্ঠান আছে, তার অন্তর্গত ক'রে শান্তিনিকেতনের চারি দিকে যে-সমস্ত গ্রাম আছে সে গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের আশ্রমে আমরা প্রধানত বিদ্যাচর্চা করে থাকি বটে, কিন্তু আমার বরাবর এই মত— বিদ্যাকে, স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করলে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে মিশ খায় না, তাকে জীবনের বস্তু করা যায় না। এইজন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে চেষ্টা করছি চারি দিকের গ্রামের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের বিদ্যানুশীলনের কর্মকে একত্র করতে। এই কাজ আমাদের চলছিল। এখানে এই সভাগৃহে আমাদের এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। যাঁরা সে সভাক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা জানেন কিরকম ভাবে আমাদের কাজ হচ্ছে। এই কাজ হাতে নিয়ে প্রথমে দেখা গেল— রোগের ছবি। আমরা অব্যবসায়ী, আমাদের তখনও সাহস ছিল না যে দেশের লোককে বলি যে, যাঁরা অভিজ্ঞ, গ্রামের রোগনিবারণ কাজে তাঁরা সহায়তা করুন। নিজেরাই যেমন করে পারি চেষ্টা করেছি। এ সম্বন্ধে বিদেশী লোকের কাছে সাহায্য পেয়েছি, সে কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি। আমরা আমেরিকার একটি মহিলাকে সহায়-রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে

হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে, সেইটাকে মাত্র নিয়ে তিনি রোগীদের ঘরে ঘরে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন, অতি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন— অত্যন্ত ক্ষত ঘা, যা দেখে ভদ্র সমাজের লোকের ঘৃণা হয়, সে-সমস্ত নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়েছেন— যারা অন্ত্যজ জাতি তাদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, পথ্য খাইয়েছেন— আজ পর্যন্ত তিনি কাজ করছেন, অসহ্য গরমে শরীরের গ্লানি সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্মও তিনি ছাড়েন নি। শরীর যখন ভেঙে পড়ল, শিলং গিয়ে কিছুদিন ছিলেন, ফিরে এসে আবার শরীর নষ্ট করেছেন। এমন করে তাঁকে পেয়েছি। তাঁকে দেশে যেতে হবে, যে-কয়টা দিন আছেন প্রাণপাত করে সেবা করছেন।

আর-এক জন সহৃদয় ইংরেজ এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের খরচে বিদেশ থেকে নিজে টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি দিনরাত চতুর্দিকের গ্রামগুলির দুরবস্থা কী করে মোচন হতে পারে, এর জন্য কী না করেছেন বলে শেষ করা যায় না। যে দুজনের সহায়তা পেয়েছি সে দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন, এঁদের নিয়ে কাজ করছি।

এইটে আপনারা বুঝতে পারেন, পতঙ্গে মানুষে লড়াই। আমাদের রোগশত্রুর বাহনটি যে ক্ষেত্র অধিকার করে আছে সে অতি বিস্তীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ জায়গায় পতঙ্গের মতো এত ক্ষুদ্র শত্রুর নাগাল পাওয়া যায় না। অন্তত ২।৪ জন লোকের দ্বারা তা হওয়া দুঃসাধ্য, সকলে সমবেতভাবে কাজ না করলে কিছুই হতে পারে না। আমরা হাৎড়াচ্ছিলাম, চেষ্টামাত্র করছিলাম, এমন সময় আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, মেডিকেল কলেজে পড়ে, আমার কাছে এসে বললে, 'গোপালবাবু খুব বড়ো জীবাণুতত্ত্ব-বিদ্, এমন-কি ইউরোপে পর্যন্ত তাঁর নাম বিখ্যাত। তিনি খুব বড়ো ডাক্তার, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। আপনারা ম্যালেরিয়ার সহিত লড়াই

করতে যাচ্ছেন, তিনি সে কাজ আরম্ভ করেছেন ; নিজের ব্যবসায়ে ক্ষতি করে একটা পণ নিয়েছেন— যতদূর পর্যন্ত সম্ভব বাংলাদেশকে তার প্রবলতম শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবেন।' যখন এ কথা শুনলাম, আমার মন আকৃষ্ট হল। আমাদের এই কাজে তাঁর সহায়তা দাবি করতে সংকল্প করলুম। মশা মারবার অস্ত্র পাব এজন্য নয় ; মনে হল এমন একজন দেশের লোকের খবর পাওয়া গেল যিনি কোনোরকম রাগ-দ্বেষে উত্তেজনায় নয়, বাহিরের তাড়নায় নয়, কিন্তু একান্তভাবে কেবলমাত্র দেশের লোককে বাঁচাবার উপলক্ষে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন করে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন— এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ো বিরল। আমার মনে খুব ভক্তির উদ্রেক হল বলে আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় আলোচনা করতে চাই। এমন সময় তিনি স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি কীভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। তখন এ কথা আমার মনে উদয় হল, যদি এঁর কাজের সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি তা হলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয়— এঁর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।

আপনারা দেখেছেন, যুদ্ধের পর এই-যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার প্রতিভা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দৈহিক দুর্বলতা তার কারণ। যখন ব্লকেড-দ্বারা খাবার বন্ধ করা হয়েছিল, সে সময় অনাহারে অনেক মানুষ মরেছে সেইটাই বড়ো কথা নয়। যে-সমস্ত শিশুর দুধ খাওয়ার দরকার ছিল, যে-সমস্ত প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুগের শিশুরা অপরিপুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল। এর ফলে এরা বড়ো হলে তেমন বুদ্ধিশক্তির জোর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই এই হিসাবে দেখতে গেলে মাথা-গণতি অনুসারে লোকসংখ্যা হয় না,

যাদের মাথা আছে তাদের কার্যকারিতা কতদূর তা দেখতে হবে। শুধু সংখ্যাগণনা ঠিক গণনা নয়। বাংলাদেশে আমরা ভাবছি না— যেখানে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল উৎস সেখানে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা রোগের বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চিরদুর্বলতা বহন করে আছি। প্রতি বৎসর কত লোক জন্মাচ্ছে, কত লোক মরছে, সংখ্যা কত বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা বড়ো কথা নয়; যারা টিঁকে রইল তারা মানুষের মতো রইল কি না সেইটে বড়ো কথা। তাদের কার্যকারিতা, মাথা খাটাবার শক্তি আছে কি না সেইটে বড়ো কথা। নতুবা জীবন্মৃতের দল যদি অধিকাংশ হয়, তার বোঝা জাতি বইতে পারবে না। শারীরিক দুর্বলতা থেকে মানসিক দুর্বলতা আসে। ম্যালেরিয়া রক্তের মধ্যে অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও বল পাই না। যার প্রাণের প্রাচুর্য আছে সে প্রাণ দিতে পারে। যার কেবল কোনোরকমে বেঁচে থাকা চলে, জীবনধারণের জন্য যা দরকার তার বেশি যার একটু উদ্‌বৃত্ত হয় না, তার প্রাণে বদান্যতা থাকে না। প্রাণের বদান্যতা না থাকলে বড়ো সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানে প্রাণের কৃপণতা সেখানে ক্ষুদ্রতা আসবে। প্রাণের শক্তির এত বড়ো ক্ষয় কোনো সভ্য দেশে কখনো হয় নি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্গতির কারণ সব দেশেই আছে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব কী। না, সেই দুর্গতির কারণকে অনিবার্য ব'লে মনে না ক'রে, যখন যাতে কষ্ট পাচ্ছি চেষ্টা-দ্বারা তাকে দূর করতে পারি; এ অভিমান মনে রাখা। আমরা এতদিন পর্যন্ত বলেছি, ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী তার সঙ্গে কী করে লড়াই করব, লক্ষ লক্ষ মশা রয়েছে তাদের তাড়াব কী করে, গভর্মেণ্ট আছে সে কিছু করবে না— আমরা কী করব! সে কথা বললে চলবে না। যখন আমরা মরছি, লক্ষ লক্ষ মরছি— কত লক্ষ না ম'রেও ম'রে রয়েছে— যে করেই হোক এর যদি প্রতিকার না

করতে পারি আমাদের কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ম্যালেরিয়া অন্য ব্যাধির আকর। ম্যালেরিয়া থেকে যক্ষ্মা অজীর্ণ প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়। একটা বড়ো দ্বার খোলা পেলে যমদূতেরা হুড়্ হুড়্ করে ঢুকে পড়ে, কী করে পারব তাদের সঙ্গে লড়াই করতে। গোড়াতে দরজা বন্ধ করা চাই, তবে যদি বাঙালি জাতিকে আমরা বাঁচাতে পারি।

আর-একটা কথা আছে, সেইটে আপনারা ভাববেন। এই-যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস এ যদি কোনো-এক জায়গায় মানুষ দূর করতে পারে— সমস্ত অমঙ্গল, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিধিলিপি বলে মেনে আসছি, যদি এর উল্টা কথা কোনো উপলক্ষে বলতে পারি— মস্ত কাজ হয়। শত্রু যত বড়োই হোক, তাকে মানিব না, মশাকে রাখব না, যেমন করে পারি উচ্ছেদ করব— এ সাহস যদি হয়, তবে কেবল মশা নয়, তার চেয়ে বড়ো শত্রু নিজেদের দীনতার উপর জয়লাভ করব।

আর-একটা কথা— পরস্পরের মিলনের নানা উপলক্ষ চাই। এমন অনেক উপলক্ষ চাই যাতে আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলতে পারে। দেশ বলতে যা বুঝি সকলে তা বোঝে না, স্বরাজ কী অনেকে তা বোঝে না। কিন্তু মিলন বলতে যা বুঝি, এমন কেউ নেই যে তা বোঝে না। কিন্তু যদি কোনো-একটা গ্রামের সকলে মিলে কিছু পরিমাণেও রোগ কমাতে পারি, তবে বিদ্বান্ মূর্খ সকলের মেলবার এমন সহজ ক্ষেত্র আর হতে পারে না। গোপালবাবু এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এই-যে ইনি মণ্ডলদের নাম করলেন, শুনে সুখী হলাম এঁরা একযোগে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে অতি ক্ষুদ্র শত্রু মশা মারবার জন্য সকলে মিলে লেগেছেন। এর মতো সুলক্ষণ আর নেই। কারণ, প্রত্যেকের হিতের জন্যে সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই ভালো। একটি গ্রামের

মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গোরুর গাড়ি চলায় তার একটা জায়গায় গর্ত হয়েছে— ৪।৫ হাতের বেশি নয়— বর্ষার সময় তাতে এক-হাঁটুর উপর কাদা জমে আর সেই কাদার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ হাটবাজার করতে যায়। নিকটবর্তী গ্রামের লোক যারা সবচেয়ে কষ্ট পায় তারাও এ কথা বলে না 'কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি ফেলে জায়গাটা সমান করে দিই', তার কারণ তারা ঠকতে ভয় পায়। তারা ভাবে, 'আমরাই খাটব অথচ তার সুবিধে আমরা ছাড়াও অন্য সবাই পাবে, এর চেয়ে নিজেরা দুঃখ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি— একটা গ্রামে বৎসর-বৎসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়া ছিল না, আমি তাদের বললুম, 'তোমরা কুঁয়ো খোঁড়ো, আমি সে কুয়ো বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'বাবু, মাছের তেলে মাছ ভাজতে চাও! অর্থাৎ, অর্ধেক খাটুনি আমাদের, অথচ জলদানের পুণ্যটা সম্পূর্ণ তোমার! তার চেয়ে ইহলোকে আমরা জলাভাবে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি যে সস্তায় সদ্‌গতি লাভ করবে সে সইতে পারব না।'

দেশের মধ্যে এরকম ভাব রয়েছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও আছে অন্য নানা আকারে, সে কথা আলোচনা করতে সাহস করি না। গোপালবাবু যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাতে লোকে এই কথা বুঝতে পারবে যে, পাশের লোকের বাড়ির ডোবায় যে মশা জন্মায় তারা বিনা পক্ষপাতে আমারও রক্ত শোষণ করে, অতএব তার ডোবার সংস্কার করা আমারও কাজ।

গোপালবাবু মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লোভ ক্রোধ বিদ্বেষের উত্তেজনা -বর্জিত নির্মল শুভবুদ্ধি তাঁকে এই কাজে আকৃষ্ট করেছে। মহত্ত্বের এই দৃষ্টান্তটি মশকবধের চেয়েও আমাদের কাছে কম মূল্যবান নয়। এইজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

২৯ আগস্ট ১৯২৩

ম্যালেরিয়া

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

এই-যে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা ও চেষ্টা, আজকে ওঁদের যে-বিষয়ক বিবরণের জন্য এই সভা আহূত হয়েছে, এতে আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছেন। এ কথা আপনাদের অবিদিত নয় যে, আমার কোনো অধিকার নাই এখানে আসন গ্রহণ করবার। একমাত্র যদি থাকে সে এই বলতে পারি আমার শরীর অসুস্থ— আমি রোগী, কিন্তু ম্যালেরিয়া-রোগী নই, সুতরাং সে দিক থেকেও আমার বলবার কথা কিছু নাই। একটা আসল কথা এই— এই ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভার মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ কেহ আছেন, তাঁরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বহু রচনা চারি দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন— এ বিষয়ে তাঁরা কাজ করেন, সুতরাং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অত্যুক্তি না'ও হতে পারে। যা হোক, আমার যা বলবার দু-একটা কথায় বলে বিদায় নেব, আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি, কারণ এ আহ্বানকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নাই।

আমার পূর্ববর্তী বক্তার যা বলবার কথা তার ভিতর অনেক ভাববার বিষয় আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে-সমুদয় ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করেছে তার একটিমাত্র কারণ নয়, প্রশ্নটি বহু জটিল, সহজে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে না। এক দিক থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে গিয়ে আর-এক দিকে ছেঁদা বেরুতে পারে— এ কথা যা বলেছেন অন্যায় বলেন নি, অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। সব দিক থেকে আট-ঘাট বেঁধে ম্যালেরিয়াকে না ঢুকতে দেওয়া, তাড়া করে বের করে দেওয়া, এর সব দিক আমাদের হাতে নাই। এ কথা সত্য, মস্ত সত্য যে, পূর্বে যেখানে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না সেখানে ম্যালেরিয়া

এসেছে। তার একটা কারণ রেলওয়ে এ দেশে তখন ছিল না, স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল না। মশা উৎপন্ন হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই দাঁড়িয়েছে যে, রেলওয়ে লাইন দু ধারের গ্রামগুলিকে অত্যন্ত আঘাত করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আরও ঘটনা ঘটেছে— যাঁরা বাণিজ্যের দিকে, প্রভুত্বের দিকে, লাভের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁদের লোভের দরুন অসহ্য দুঃখ এ দেশে উপস্থিত হয়েছে, বন্যা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ জেগে উঠেছে, এটা খুব বড়ো সমস্যা তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বক্তা-মহাশয় একটা বিষয়ে ভুল করেছেন। আমাদের মাননীয় বন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন এ যদি শুধু মশা মারার কাজ হত তা হলে আমি একে বড়ো ব্যাপার ব'লে মনে করতুম না। দেশে মশা আছে এটা বড়ো সমস্যা নয়, বড়ো কথা এই— দেশের লোকের মনে জড়তা আছে। সেটা আমাদের দোষ, বড়োরকম দুঃখ-বিপদের মূল কারণ সেখানে। ওঁরা এ কাজ হাতে নিয়েছেন, সেজন্য ওঁদের কাজ সকলের চেয়ে বড়ো বলে মনে করি। গোপালবাবু উপকার করবেন ব'লে কোমর বেঁধে আসেন নি। কোনো-একজন ব্যক্তি বলতে পারে না, 'আমি কুইনাইন দিয়ে বা ইন্‌জেক্‌শন করে দেশের সকল রোগ ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নিবারণ করব।' এমন কথা বলবার দোষ আছে, কারণ তাঁরা কতদিন পৃথিবীতে থাকবেন। আজ বাদে কাল চলে যেতে কতক্ষণ। কতরকম ব্যাধি-বিপদ আছে। যদি ব্যক্তিগত কয়েকজন লোকের উদ্যমকে একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করি তা হলে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সকলরকম দুর্গতি-নিবারণের জন্য আমরা বাহিরের লোকের সহায়তা বরাবর অপেক্ষা করেছি। এমন দিন ছিল যখন রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষী হয়ে দেশ ছিল না, এমন সময় ছিল যখন দেশের জলাভাব দেশের লোক নিবারণ করেছে— অন্যান্য অভাবও দেশের

লোক নিবারণ করেছে। কিন্তু তার ভিতর একটা দুর্বলতা ছিল ব'লে আমরা আজ পর্যন্ত দুঃখের হাত এড়াতে পারছি না। যারা সেকালে কীর্তি অর্জন করতে উৎসুক ছিল, যাঁরা উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁদের উপর দেশের লোক দাবি করেছে। তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি— তাঁদের উপর জল দেবার, মন্দির দেবার, অতিথিশালা করে দেবার, আরও অন্যান্য অভাব মোচন করবার দাবি করেছি— তাঁদের পুরস্কার ছিল ইহকালে কীর্তি ও পরকালে সদ্‌গতি। এখনকার দিনে তার ফল এই দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা এখন পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে কে এসে তাদের জলদান করবে— জলদান পুণ্যকর্ম, সে পুণ্যকর্ম কে করবে। অর্থাৎ, তাদের বলবার কথা এই— 'আমাকে জলদান-দ্বারা তুমি আমার উপকার করছ সেটা বড়ো কথা নয়, তুমি যে পরকালে পুরস্কার পাবে সেজন্য তুমি করবে।' এই-যে তার প্রতি দাবি, এবং তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, সেটা আজ পর্যন্ত গভীরভাবে আমাদের দেশে আছে। এই একটা অসত্যের সৃষ্টি হয়েছে— সর্বসাধারণ সকলে একত্র সম্মিলিত হয়ে নিজের অভাব নিজেরা দূর করবার জন্য কখনও সংকল্প করে না। এমন দিন ছিল যখন দেশে উপকারী সুহৃদ লোকের অভাব ছিল না, সুতরাং সহজেই তখন গ্রামের উন্নতি হয়েছে, অভাব দূর হয়েছে। কিন্তু এখন সে দিনের পরিবর্তন হয়েছে, নূতন অবস্থার উপযোগী চিত্তবৃত্তি এখনও আমরা পেলুম না— এখনও যদি আমরা পুণ্যকর্মী কোনো সুহৃদের উপর ভার দিই, দেশের জলাভাব, দেশের রোগ তাপ সে এসে দূর করুক, তা হলে আমাদের পরিত্রাণ নেই। এখানে বলবার কথা এই, 'তোমরা দুঃখ পাচ্ছ, সে দুঃখ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে দূর করতে না পারবে ততক্ষণ যদি কোনো বন্ধু বাহির থেকে বন্ধুতা করতে আসে তাকে শত্রু বলে জেনো। কারণ, তোমার ভিতর যে অভাব আছে সে তাকে চিরন্তন করে দেয়, বাহিরের অভাব দূর করবার চেষ্টা-দ্বারা।

গোপালবাবু যে ব্যবস্থা করেছেন, যাকে পল্লীসেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ তোমরা একত্র সমবেত হয়ে তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমাদের দুঃখ দূর করো। এ কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তারা (গ্রামের লোক) বিশ্বাস করতে পারে নাই যে নিজের চেষ্টায় দুঃখ দূর করা যায়। সাধারণ লোকের এমন অভিজ্ঞতা কোনো কালে ছিল না। পূর্বে অসাধারণ লোকেরা তাদের উপকার করেছে, তাদের তারা খুব সম্মান করেছে। এখনও দেখি সে দিকে তারা তাকাচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস তাদের কেউ গোপালবাবুর উপর ক্রুদ্ধও হতে পারে এইজন্য— 'ইনি আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন কেন, নিজে আমাদের ঔষধপত্র দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করলেই তো পারেন।' একটা প্রচলিত গল্প আছে— একজন মা-কালীকে মানত করেছিল মোষ দেবে। অনেকদিন অপেক্ষা করে মা-কালী মোষ না পেয়ে দেখা দিলেন, তখন সে বললে, 'মোষ দিতে পারব না, একটা ছাগল দেব।' আচ্ছা, তাই সই। তার পর ছাগল দেয় না। আবার দেখা দিলেন; লোকটি বলল, 'মা, ছাগল পাই না, একটা ফড়িং দেব।' 'আচ্ছা, তাই দাও!' তখন সে বললে, 'এতই যদি মা, তোমার দয়া, তবে একটা ফড়িং নিজে ধরে খাও-না কেন।' এও তাই, আমাদেরও সেরকম অবস্থা। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি, সে ঘটনাটি এই— আমাদের একটা গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিল, গ্রামবাসীদের ফি বৎসর বড়ো জলাভাব হত। আমি বললাম, 'তোমরা কুয়া খোঁড়ো, আমি বাঁধিয়ে দেবার খরচ দেব।' তারা বললে, 'মহাশয়, আপনি কি মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চান? আমরা খরচ দিয়ে কুয়া খুঁড়ব আর স্বর্গে যাবেন আপনি।' আমি বললাম, 'তোমরা যতক্ষণ কুয়া না খোঁড় আমি কিছুই দেব না।' কুয়া হল না। গ্রামে প্রতি বৎসর আগুন লাগছে, তাদের পাড়ার মেয়েরা ৪।৫ মাইল দূরে বালি ভেঙে অসহ্য রৌদ্রে জল নিয়ে আসে, ঘরে অতিথি এলে একঘটি জল দিতে প্রাণে কষ্ট হয়,

কিন্তু কয়জনে মিলে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তে পারবে না। কেহ বলছে, 'কোন্ জায়গায় দেব, ওর বাড়ির দুই হাত দূরে, ওর বাড়ির কাছে পড়ে; আর-একজন যে জিতল, আমার চেয়ে দুই হাত জিতল— এটা সহ্য হয় না।' নিজেদের পরস্পর চেষ্টা-দ্বারা পরস্পর কল্যাণের প্রবৃত্তি কারও মনে জেগে উঠে না, সকলের যাতে কল্যাণ হয় সে চেষ্টা আমাদের দেশে হল না, তাতে দুর্গতির একশেষ হয়েছে। আমি দেখেছি— একটা গ্রামে মস্ত রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল, ক্রমাগত গোরুর গাড়ি যাওয়ায় এক জায়গায় একটা খাদ হয়, বর্ষার সময় হাঁটু পর্যন্ত কাদা হয়, যাওয়া-আসার বড়ো কষ্ট হত। তার দু পাশে দুখানি বড়ো গ্রাম, দু ঘণ্টা কাজ করলে এটা ভরাট করা যেতে পারে। কিন্তু তারা বললে, তারা দু ঘণ্টা কাজ করবে, আর যারা কুষ্টিয়া থেকে কি অন্য জায়গা থেকে আসবে তারা কিছু করবে না— তারা সুবিধা পাবে! নিজে শত অসুবিধা ভোগ করবে তবু পরের সুবিধা সহ্য করতে পারবে না— দূরের লোক তাদের ঠকালো ক্রমাগত এই ভয়। অন্যে পরিশ্রম না করে আমার পরিশ্রমের সুবিধা ভোগ করবে, আমার পরিশ্রমের ফলে সকলের কল্যাণ হবে— এটা তারা সহ্য করতে পারে না। না করতে পারার কারণ এই— কর্মের পুরস্কার মনে মনে কল্পনা। নিজের পুরস্কার কামনা ক'রে কর্মের প্রতি যে ঝোঁক জন্মে সে কর্ম হীনকর্ম। সর্বসাধারণের কল্যাণ হোক, নাহয় আমার পরিশ্রম হল, এ কথা তারা বুঝতে পারে না। দুঃখ দিয়ে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে, মরতে হয় তারা মরুক, মৃত্যুদূতের কানমলা খেয়ে যদি তাদের চৈতন্য হয় তাও ভালো। গ্রামে গ্রামে ঔষধ পথ্য দিয়ে গোপালবাবু সরে যাবেন এ কথা তিনি বলেন নি বটে— যাকে সেবা বলে তিনি তাই করছেন, বেশি দিন তা করবেন না। যেই তারা বুঝবে এই প্রণালীতে উপকার হয়, অমনি ওঁরা সরে আসবেন তাদের উপর ভার দিয়ে।

গাঁয়ে না গেলে বুঝতে পারবেন না ম্যালেরিয়া কী ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকের যকৃৎ-পিলেতে পেট ভর্তি হয়ে আছে, সুতরাং ম্যালেরিয়া দূর করতে হবে বেশি করে বুঝাবার দরকার নাই। আমরা অনেকে জানি ম্যালেরিয়া কিরকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। এ দেশে অনেক জিনিস হয় না; অনেক জিনিস আরম্ভ করি, শেষ হতে চায় না; অনেক কাজেই দুর্বলতা দেখতে পাই— পরীক্ষা করলে দেখা যায় ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্য থেকে তেজ কেড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করবার ইচ্ছাও হয় না। সকলেই জানেন বাংলাদেশের কাজকর্মে পশ্চিম থেকে লোক আসে। যেখানে বাংলার জেলে ছিল সেখানে হিন্দুস্থানি জেলে এসেছে। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ নিস্তেজ, কাজেই উৎসাহ নেই। প্রভুরা বলেন বটে, চালাকি করছে, ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে, মজুরেরা কাজ করে না, আফিসে কেরানিরা কাজে মন দেয় না। জোয়ান জোয়ান সাহেব তোমরা বুঝবে কী করে— ওরা চালাকি করে না; ম্যালেরিয়ায় যারা জীর্ণ, নিয়ত কাজ করবার, কাজে মন দেবার শক্তি তাদের নাই; মশার কামড় খেয়ে ওদের এরকম অবস্থা হয়েছে। কিছু-দিন এ দেশে থাকো, এটা ভালো করে বুঝতে পারবে।

তাই বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকো না, মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে থেকো না। সাহস করো— আমাদের দুঃখ আমরা নিবারণ করতে পারব, শুধু সাহস চাই। কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা কর্মে যদি একবার জয়পতাকা খুলে দিতে পারো— সাহস আসবে। ম্যালেরিয়ায় কত লোক মরছে রিপোর্ট্ দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি শুনেছি তার খুব পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে বিশ্বাস। বাংলাদেশ থেকে মশা দূর করা সম্পূর্ণ না হোক, এতটা পরিমাণেও যদি হয় অনেক উন্নতি হবে। এতে যে কেবল মশা মরবে তা

নয়, জড়তা মরবে। নিজের প্রতি নিজের যে বিশ্বাস সেই চিরন্তন ভিত্তি, চিরকেলে ভিত্তি ; কিন্তু মশা চিরকাল থাকবে ওঁর উপর যদি মশা মারবার ভার দিই। শক্তি যদি দেশের মধ্যে জাগে, গ্রামের লোক যদি বলে— 'আমরা কারও দিকে তাকাব না। যে-কোনো পুণ্যলোভী উপকার করবে তাকে অবজ্ঞা করব, ভিক্ষা করব তবু তেমন লোকের উপকার চাইব না। কলিকাতা থেকে যারা আসবে তাদের বলব তোমরা আমাদের ভারী সুহৃদ্. নাম করতে এসেছ, কাগজে বড়ো বড়ো রিপোর্ট্ লিখবে, তাই দেখে সকলে বাহবা দিবে। কোনোদিন তো দেখি নি তোমরা আমাদের উপকার করেছ। বরাবর জানি ভদ্রলোক সুদ নেয়, ভদ্রলোক ওকালতি করে, সর্বনাশ করে— জমিদার আছে, তারাও ভদ্রলোক, বরাবর রক্ত শোষণ করছে— গোমস্তা পাইক রয়েছে, তারা উৎপীড়ন করছে— এই তো ভদ্রলোকের পরিচয়। হঠাৎ আজ উপকার করতে এলে কেন ?' যদি এ কথা বলে তবে খুশি হই, সে কথা বলতে হবে।

আমাদের বিশ্বভারতীর একটা ব্যবস্থা আছে— তার চারি দিকে যে-সমস্ত পল্লী আছে সেগুলিকে আমরা নীরোগ করবার জন্য কিছু চেষ্টা করেছি। এটুকু তাদের বুঝিয়েছি যে, 'ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছি সে আমাদের অপরাধ নয়, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের মিল আছে।' সে কথা তারা বিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে গিয়ে যা দেখেছি তাতে আমাদের চৈতন্য হয়েছে। আমরা যে-সমস্ত বড়ো বিল্ডিং করতে চেষ্টা করছি, পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক জয়স্তম্ভ করবার চেষ্টা করছি, মালমসল্লার চেষ্টা করছি— কিসের উপর ? বালির উপর— প্রাণ নাই, জীর্ণ জরাজীর্ণ অস্থিমজ্জায় দুর্বলতা প্রবেশ করেছে, নৈতিক নয়— বাস্তবিক, শারীরিক, কিন্তু সে মানসিক শক্তিকে নষ্ট করে। এক-আধজন এই বহুব্যাপী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতাকে দূর করতে চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু

বাংলা এখনও রোগ-তাপ-দুঃখে ক্লিষ্ট, জয়স্তম্ভ থাকবে না, কাত হয়ে পড়ে যাবে, একে রক্ষা করতে পারবে না, ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে নইলে টিঁকবে না। দুর্বলতা এক রূপে না এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করবে। দুর্বলতার একটা কুশ্রী আকার আছে। সে হচ্ছে, আর-একজন গিয়ে সফলতা লাভ করবে, বড়ো কাজ করবে, এতে দুর্বলের মনে ঈর্ষা হয়— কী করে তাকে ছোটো করা যায় প্রাণপণে সে চেষ্টা করে। আমি কারও দোষ দিই না। পিলে যকৃৎ ভিতরে বড়ো হলে হৃদয় বড়ো হতে পারে না। পিলে বড়ো হয়েছে, যকৃৎ বড়ো হয়েছে, অন্তরে তারা জায়গা করেছে, হৃদয়ের জায়গা ছোটো, এইজন্য বরাবর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে সকলের চেয়ে বড়ো কর্মী নিজে, আর কেহ নয়। মনে শান্তি নাই, তার কারণ ভিতরকার ঈর্ষা। যে নিজে কিছু করতে পারছে না তার ভিতরে মাৎসর্য ফুটে ওঠে। আমি পারছি না, অমুক পারছে, চেষ্টা করছে, তখন 'ওর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি' এ কথা বললে অন্তঃকরণ শান্ত হয়— সুস্থ হয়। আমাদের দেশে এমন কর্মী কেহ নাই যার সম্বন্ধে আমরা এইরকম ভাব কোনো-না-কোনো আকারে মনে পোষণ না করে থাকি, তার কীর্তি কিছু-না-কিছু খর্ব না করতে চাই। এর কারণ সেই ম্যালেরিয়ার ভিতরে— দেহের শক্তি মনের শক্তিকে নষ্ট করেছে। তা হলে আপনারা বলতে পারেন, 'আগে দেহে শক্তি সঞ্চয় করুন।' তা নয়, মানুষকে ভাগ করা যায় না; দেহ মন আত্মায় সে এক, আগে এইটে পরে ঐটে বলা চলে না। মনে জোর দিলে দেহে জোর পাই, দেহে জোর দিলে মনে জোর পাই, আবার দেহ-মনে জোর দিলে ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়— দেহ মন আত্মা একসঙ্গে গাঁথা। যে মন্ত্রে দেহের রোগ দূর হবে সে মন্ত্রে মনের যে দীনতা পর-নির্ভরতা তাও দূর হবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, এই-যে রেলওয়ে হয়েছে, ফলে জল-নিকাশের পথ বন্ধ হয়েছে— মস্ত মস্ত কারবারী

লোক, তারা কিভাবে আমাদের দিকে তাকায়, কী দুঃখ আমরা ভোগ করছি তারা কি সেটা বোঝে। বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, তারা লাভের উপর লাভ করে যাচ্ছে, গলা পর্যন্ত যারা লাভ করেছে তাদের পরিত্রাণের আশা নাই। তারা এই-সমস্ত রেলওয়ে লাইন খুলছে। আমরা কে। আমরা 'থামো থামো' বললেই কি রেলওয়ে থামবে। না ক্রমাগত বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে? মস্ত মস্ত কারবারী তারা এই-সমস্ত করছে, আমরা কেঁদে কী করব। তবে কী হবে। সমস্ত গ্রামের লোক যদি বোঝে আমরা কেউ কিছু নয়, এটা নয়; যখন তারা বুঝবে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি একটা মস্ত বড়ো জিনিস— ইচ্ছা করলে সকলে মিলে মিশে মরতে পারে, তখন তারা সকলে মিলে এই দুর্গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সকলে কণ্ঠ তুলে বলতে পারে, 'ভাঙব তোমার রেলওয়ে লাইন। আমরা মরব আর তোমরা লাভ করবে?' এখন বলতে পারবে না। (আপনারা করতালি দেবেন না।) এর জন্যে অনেক ভিত্তি গাড়তে হবে, অনেক দূর গভীর করে— এটা সকলের চেয়ে বড়ো কাজ। আমি অনেকবার বলেছি— কবি বলে আমার কথা শোনে নাই— আমি বলেছি সমাজের ভিতর থেকে সমাজের শক্তিকে জাগাতে হবে, পরস্পর সকলের সমবেত চেষ্টা-দ্বারা শক্তি লাভ করবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টাও করেছি, পল্লী-সমিতি ব'লে সমিতি গড়ে তুলেছি, এ বিষয়ে আমার মাথা ততটা খেলাতে পারি নাই। আজ দেখে আনন্দ হয়েছে— এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন্ জায়গায় আমাদের গলদ। গগনস্পর্শী পার্লিয়ামেণ্ট্ হলে হবে না। আমাদের অভাব এখানে নয়। আমাদের অভাব ভিতরে— যার উপর গড়তে পারব। একবার মুষ্টিমেয় কলেজে-পড়া উপাধিধারী কয়েকজন ভেবেছিল, 'আমাদের চেষ্টার উপর, উদ্যমের উপর দাঁড় করাতে পারব।' মরে গিয়েছে—সমস্ত দেশ ক্রমে ক্রমে

জীবন্মৃত হয়েছে তা নয়— যথার্থ মরেছে। সেদিন আমাদের একদল লোক চিত্রকলা অভ্যাস করতে গ্রামের চিত্রকলা দেখতে গিয়েছিল। তারা এসে বললে, 'আমাদের আর অন্নে রুচি হয় না; দেখলাম একেবারে উজাড় হয়েছে— একটা গ্রামে, বড়ো গ্রামে, বড়ো বড়ো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চার ঘর কায়স্থ রয়েছে। এখনও বেঁচে আছে কী করে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমরা বৎসরের মধ্যে দুবার আসানসোল কি বর্ধমানে গিয়ে সম্বৎসরের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। যে কয়দিন বেঁচে আছি এমনি ভাবে যাবে, যখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসবে যাব। এক জায়গায় দেখলাম— সমস্ত বড়ো বাড়ি। যারা ৫০।১৫০ বৎসর পূর্বে বর্ধিষ্ণু লোক ছিল এখন সেখানে তাদের রথ পড়ে আছে, দেবতা অচল।' এইটা শুনাব না মনে করেছিলাম। আপনাদের মধ্যে অনেকে ধর্মপ্রাণ আছেন, তাঁরা বলবেন, 'আমরা গিয়ে দেবতার রথ চালাব।' আমি বলি সে চলবে না, দেবতা তোমাদের হাতের টানে চলবে না, দেবতা তার নিজের শক্তির রথে চলবে, গ্রামের লোকের নিজের শক্তির রথে চলবে, সে রথ বাঁশ কেটে করতে হবে তা নয়, সে পিতলের রথ— আশ্চর্য কারুকার্য— মোটা মোটা বাঁশ দিয়ে তা চালালে চলবে না, ঠাকুর তাতে চলে না, ঠাকুর চান আমাদের হৃদয়ের সেবা দিয়ে তাঁর রথ তৈয়ারি হোক— তাঁর রূপের অন্ত নাই। তাঁকে মেরে ফেলে মুমূর্ষুর গঙ্গাযাত্রার মতো তাঁকে কি টেনে নিয়ে যেতে হবে। তা তো নয়। কোথায় প্রাণ, যে প্রাণ-প্রাচুর্যের ভিতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, যে সৃষ্টি সম্পদে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকে বিকশিত হয়, বসন্তের মতো নূতন প্রাণ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যেখানে, দেবতা সেখানে চলেন। নইলে তাঁর ভাঙা রথ যত জোরেই টানো দেবতা চলবেন না। বাংলার সর্বত্র দেবতার ভাঙা রথ পড়ে আছে, দেবতা যদি চলত আমাদের এ দশা হত

না, আমরা এমন করে মৃতকল্প হয়ে পড়ে থাকতুম না, এমন করে ঘরের আলো নিভে যেত না। এত দুর্গতি কেন। আমাদের রথ আমরা তৈয়ার করি নাই। যা ছিল তারও চাকা ভেঙে গেছে। এমন কেহ নাই তাকে ব্যবহারে চালাতে পারে। ছোটোখাটো একটা-কিছু তৈয়ারি ক'রে উপস্থিতমত চালিয়ে দেওয়া, বিষয়ী লোকের কথা। ছোটোখাটো লাভের কথায় হানি আছে। সর্বকালের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হবে, বড়োকে ভূমাকে লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তবে তাকে পাব, তবে তিনি তৃপ্ত হবেন, প্রসন্ন হবেন। তিনি প্রসন্ন হলে সকল তাপ দূর হয়ে যাবে। সেইজন্য সকলের চেয়ে বড়ো কাজ— ওঁরা যা করেছেন— উদ্‌বোধন, পল্লীর শক্তির উদ্‌বোধন। এরা একদিন দাঁড়িয়ে বলবে, 'কাউকে মানব না, যেখানে অন্যায় পাপ দুঃখ শোক সেখানে তাকে তাড়া করে যাব।' আজকে মশা থেকে আরম্ভ হয়েছে, এ কাজে আমাদের রায়বাহাদুর লেগেছেন। আমি ইন্‌জেক্‌শন করতে জানি না, কী পরিমাণ কুইনাইন দিতে হয় জানি না, কিন্তু এটা জানি এবং এই-জন্য বহুকাল অরণ্যে রোদন করেছি— কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে তা হয় না, তাতে ভগবান প্রসন্ন হন না, সে পথ আপনার ঘরের ভিতরকার হলেও যখনই তাতে নির্ভর করেছ তখনই দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছ, কেননা তিনি অন্তরের ভিতর আছেন, আমার অন্তরের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি তাকে জাগাতে হবে, তিনি জাগলে সব দূর হয়ে যাবে, সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। কেউ কবি হতে পারে, কেউ ডাক্তার হতে পারে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে— যার যেরকম শক্তি, যার যেরকম শিক্ষা, সকলরকম চিত্তবৃত্তির সকলরকম শক্তির দরকার আছে। অনন্ত শক্তির উৎস যিনি তাঁর বহুধা শক্তি -দ্বারা তিনি বিশ্বকে পালন করেন। কেবল ইকনমিক্‌স্‌ নয়, কেবল পলিটিক্‌স্‌ নয়— বহুধা শক্তি, সে বৃহৎ

শক্তিকে যদি আমাদের সমাজের ভিতর, নিজের ভিতর স্বীকার করো তা হলে অনন্ত শক্তির উদ্‌বোধন হবে— একটা ছোটো কাজ ক'রে, একটা কথা ব'লে কিছু হবে না। আমাদের সৌন্দর্যবোধ থেকে আরম্ভ হয়ে, কী করে অন্ন অর্জন করতে হয়, কী করে চাষ করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়, সব বিষয়ে দেশের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জাগাতে হবে। কবিকে যখন সভাপতির আসনে বসিয়েছেন তখন আমি বলব এবং এটা বলবার কথা— বসন্তকালের বাঁশি এই-যে সে শুধু একটা ফুলকে জাগিয়ে দেয় না, একটা গাছের পাতাকে ফোটায় না, দখিন-হাওয়ায় পাখিরা জেগে ওঠে, লতাপাতা ফোটে, গাছের ফল ফুল সমস্ত আনন্দ-উৎসবে শক্তির উৎসবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। সেই বসন্তের বাণীকে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

প্রতিভাষণ

ময়মনসিংহে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে

মহারাজ, ময়মনসিংহের পুরবাসিগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে আপনাদের প্রীতিসুধা সম্ভোগ করছি।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলুম— তুমি কেন আজকের দিনে পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্যে এসেছ, কোন্ সাহসে তুমি বের হয়েছ। কী করতে পারো তুমি তোমার হীনশক্তিতে। এ প্রশ্নের আমার একটা খুবই সহজ উত্তর আছে। তা এই যে, আমি কোনো কাজের দাবি রাখি নে। যদি আমি কোনোদিন আনন্দ দিয়ে থাকি আমার সাহিত্য আমার কাব্যের মধ্য দিয়ে, তবে তারই প্রতিদানস্বরূপ আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য সংগ্রহ করে যেতে পারি। বাংলাদেশ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করবার পূর্বে এটুকু পুরস্কার যদি নিয়ে যেতে পারি তো সেই আমার সার্থকতা। আমি কোনো কর্ম করেছি কি না এ কথার দরকার নেই। আপনাদের এ আতিথ্যের বরমাল্যই আমার যথেষ্ট। এ খুব সহজ উত্তর, কিন্তু এ উত্তর সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর-এক দিন এসেছিল যেদিন সমস্ত বাংলাদেশে মানবের চিত্ত উদ্‌বোধিত হয়েছিল। সেদিন আমিও তার মধ্যে ছিলুম— শুধু কবিরূপে নয়— আমি গান রচনা করেছিলুম, কাব্য রচনা করেছিলুম, বাংলাদেশে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সাহিত্যে তারই রূপ প্রকাশ করে দেশকে কিছু দিয়েছিলুম। কিন্তু কেবলমাত্র সেইটুকুই আমার কাজ নয়। একটি কথা সেদিন আমি অনুভব করেছিলুম, দেশের কাছে তা বলে'ওছিলাম— সে কথাটি এই যে, যখন সমস্ত দেশের হৃদয় উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে তখন কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগের দ্বারা সেই মহামুহূর্তগুলি সমাপ্ত করে দেওয়ার মতো অপব্যয় আর কিছু নেই। যখন বর্ষা নাবে

তখন কেবলমাত্র বর্ষণের স্নিগ্ধ আনন্দসম্ভোগই যথেষ্ট নয়, সে বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে— বৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে। সেদিন আমি এ কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম— আপনাদের মধ্যে অনেকের তা মনে থাকতে পারে অথবা বিস্মৃতও হয়ে থাকতে পারেন— 'কাজের সময় এসেছে, ভাবাবেগে চিত্ত অনুকূল হয়েছে। এখনই কর্ম করবার উপযুক্ত সময়। কেবলমাত্র ভাবাবেগ স্থায়ী হতে পারে না। ক্ষণকালের যে ভাবাবেগ তা দেশের সকলের চিত্তকে, সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের শক্তি ব্যাপ্ত হলে পরই কর্মের সূত্র -দ্বারা যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হয়। কর্মের দিন এসেছে।' এই কথা আমি বলেছিলুম সেদিন। কিরূপ কর্ম। 'বাংলার পল্লী-সব আজ নিরন্ন, নিরানন্দ, তাদের স্বাস্থ্য দূর হয়ে গেছে— আমাদের তপস্যা করতে হবে সেই পল্লীতে নতুন প্রাণ আনবার জন্যে, সেই কাজে আমাদের ব্রতী হতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করেছিলুম, শুধু কাব্যে ভাব প্রকাশ করি নি। কিন্তু দেশ সে কথা স্বীকার করে নেয় নি সেদিন। আমি যে তখন কেবলমাত্র ভাবুকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম এ কথা সত্য নয়। তারও আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগেই, আমি পল্লীর কর্মের কথা বলেছিলুম— যে পল্লী বাংলাদেশের প্রাণনিকেতন সেইখানেই রয়েছে কর্মের যথার্থ ক্ষেত্র, সেইখানেই কর্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই কাজের কথা একদিন আমি বলেছিলুম, নিজে তার কিছু সূত্রপাতও করেছিলুম। যখন বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়া বইতে আরম্ভ করে তখন কেবলমাত্র পাখির গানই যথেষ্ট নয়। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ তখন নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করে দেয়। সেই বিচিত্র প্রকাশেই বসন্তের উৎসব পরিপূর্ণ হয়— সেই শক্তি-অভিব্যক্তির দ্বারাই সমস্ত অরণ্য একটি আনন্দের ঐক্য লাভ করে,

পূর্ণতায় ঐক্য সাধিত হয়। পাতা যখন ঝরে যায়, বৃক্ষ যখন আধমরা হয়ে পড়ে, তখন প্রত্যেক গাছ আপন দীনতায় স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তখন নব পুষ্প নব কিশলয়ের বিকাশে উৎসবের মধ্যে সব এক হয়ে যায়। আমাদের জাতীয় ঐক্যসাধনেরও সেই উপায়, সেই একমাত্র পন্থা। যদি আনন্দের দক্ষিণ-হাওয়া সকলের অন্তরের মধ্যে এক বাণী উদ্‌বোধিত করে তা হলেও যতক্ষণ সেই উদ্‌বোধনের বাণী আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত না করে ততক্ষণ উৎসব পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে এই-যে উৎসবের কথা বললুম তা কর্মের উৎসব। আমগাছ যে আপনার মঞ্জরী বিকশিত করে তা তার সমস্ত মজ্জা থেকে, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে। কর্মের এই চাঞ্চল্য বসন্তকালে পূর্ণ হয়। মাধবীলতায়ও এই কর্মশক্তির পূর্ণরূপ দেখতে পাই। বসন্তকালে সমস্ত অরণ্য এক হয়ে যায় বিচিত্র সৌন্দর্যের তানে, আনন্দের সংগীতে। তেমনি আমরা দেখতে পাই সব বড়ো বড়ো দেশে তাদের যে ঐক্য তা বাইরের ঐক্য নয়, ভাবের ঐক্য নয়— বিচিত্র কর্মের মধ্যে তাদের ঐক্য। জাতির সকলকে বলদান, ধনদান, জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান— এই বিচিত্র কর্মচেষ্টার সমন্বয় হয়েছে যেখানে সেইখানেই যথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কবির গানে নয়, সাহিত্যের রসে নয়— কর্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তখনই সমস্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তৃতার মিথ্যা উত্তেজনায় শুধু বাক্যে শুধু মুখে 'ভাই' বললে ঐক্য স্থাপিত হয় না। ঐক্য কর্মের মধ্যে। এই কথাই আমি বলেছিলুম, যখন মনে হয়েছিল যে, সময় এসেছে। সময় এসেছিল, সে শুভ সময় চলে গিয়েছে। তখন আমার যৌবন ছিল; সব বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়েই আমি এ কথা বলেছিলুম, কেউ গ্রহণ করলে বা না-করলে তা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

আবার দিন এসেছে— দেশের লোকের চিত্তে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অনুকূল অবসর এসেছে— এমন সময়ে বয়সের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে কী করে চুপ করে বসে থাকি। আবার স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে যে, যদি মনের মধ্যে যথার্থই আনন্দ উপলব্ধি করে থাকো তবে কেবলমাত্র বাক্যবিন্যাসের দ্বারা ভাবরসসম্ভোগে তা অপব্যয় কোরো না। যে অনুকূল সময় এসেছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার দ্বার থেকে, সকলে মিলে সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হও। সম্মিলিত দেশের সৃষ্টির মধ্যেই দেশের আত্মা তার গৌরবের স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিধাতা বিশ্বকর্মা আপনার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কোথায়। তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে। তেমনি দেশের আত্মার স্থানও দেশের যত সৃষ্টির কাজের মধ্যে, ভাবসম্ভোগে নয়। সেই বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি কি জেগেছে আজ আমাদের মধ্যে— যে শক্তিতে দেশের অন্নদৈন্য, স্বাস্থ্যের দৈন্য, জ্ঞানের দৈন্য, সব ঘুচে যাবে? বসন্তকালের অরণ্যে যেমন তরুলতা সব ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি কর্মের বিকাশে সমস্ত দেশে একটি বিচিত্র রূপ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সেই লক্ষণ কি দেখতে পাই আমরা। আমি তো সায় পাই নে অন্তরে। ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মের প্রবর্তনা অতি অল্প। কিছু কাজ যে হয় নি তা বলছি নে, কিন্তু সে বড়ো অল্প। আবার সেজন্যে পুরোনো কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আমার সময় গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, আর অধিক দিন বাকি নেই আমার। তথাপি আমি বেরিয়েছি— পুরস্কারের জন্যে নয়, বরমাল্য নেবার জন্যে নয়, করতালিলাভের জন্যে নয়, সম্মানের ট্যাক্স আদায় করবার জন্যে নয়— দেশকে আপনারা জানতে চাচ্ছেন কর্ম-দ্বারা, এইটুকু দেখে যাব আমি। জীবনের অবসানকালে আমি দেখে যেতে চাই যে, সর্বত্র কর্মশক্তি উদ্যত হয়েছে। তা যদি না দেখতে পাই তবে জানব যে, আমাদের যে ভাবা-

বেগ তা সত্য নয়। যেখানে চিত্তের সত্য-উদ্‌বোধন হয় সেখানে সত্য-কর্ম আপনি প্রকাশ পায়। দেশের মধ্যে কর্ম না দেখে আমাদের চিত্ত বিষণ্ন হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই। খর্বাকৃতি কাঁটাগাছ, মনসাগাছ দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে; তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, আছে বিরুদ্ধ রূপ আর চিত্তের দৈন্য। মরুভূমিতে প্রাণশক্তি কর্মচেষ্টাকে বড়ো করে তুলতে পারে নি, সমস্ত উদ্ভিদ সেখানে দৈন্যে কণ্টকিত। এখনও কি তাই দেখব আমাদের মধ্যে। বসন্তের দক্ষিণসমীরণ কি বইল না। মরুভূমির যে প্রাণের দৈন্য বিরোধে বিদ্বেষে ভেদে বিভেদে সব কণ্টকিত, তাই দেখব এখনও? তা হলে যে সব ব্যর্থ হবে, মরুভূমিতে বারিসেচন যেমন ব্যর্থ হয়। নেব আমরা এই শুভদিনকে, কেবল হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়— কর্মের মধ্যে চার দিকে তাকে বেঁধে নেব, কখনও যেতে দেব না— এই আমাদের পণ হোক। আমার কাজের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, কিন্তু অল্প কাজের মধ্যে সফলতার যে লক্ষণ দেখেছি, তাতে যে আনন্দ পেয়েছি, সেই আনন্দ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে চাই। পূর্বকালে এমন একদিন ছিল যখন আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রাণের প্রাচুর্য পূর্ণরূপে ছিল। গ্রামে গ্রামে জলাশয়-খনন, অতিথিশালা-স্থাপন, নানা উৎসবের আনন্দ, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা— এ-সবই ছিল। সেই ছিল প্রাণের লক্ষণ। আজকের দিনে কেন জল দূষিত হয়ে গেছে, শুষ্ক হয়ে গেছে। কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে? কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদীস্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। তেমনি এক সময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায়

১০

প্রবাহিত হত আজ তা নির্জীব হয়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফলছে না। দেশবিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে। চার দিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখছি। যদি সেদিন না ফেরাতে পারি, তবে শহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে। যখন কোনো রোগীর গায়ে ব্যথা, ফোড়া প্রভৃতি নানা রকমের লক্ষণ দেখা যায় তখন রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণকে একে একে দূর করা যায় না। দেহের সমস্ত রক্ত দূষিত হলেই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে যদি বিরোধ ভেদ বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগলক্ষণ দেখা দেয় তবে তাদের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে দূর করা যায় না। দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে স্বাস্থ্যসঞ্চার করতে হবে, তবেই সমস্ত সমাজ-দেহের বিরোধ বিদ্বেষ দৈন্য দুর্গতি সব দূর হয়ে যাবে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে আমি আজকে এসেছি। অনুকূল সময় এসেছে, বসন্তসমীরণ বইতে আরম্ভ হয়েছে— আমি অনুভব করছি যে, মনে করিয়ে দেবার দিন এসেছে। দ্বিতীয় বার যেন এ সময় আমরা নষ্ট না করি, যথার্থ কর্মে যেন আমরা ব্রতী হই। দারিদ্র্যের মাঝখানে, অপমানের মাঝখানে, দেশের তৃষ্ণার মাঝখানে, প্রত্যক্ষভাবে সকলে মিলে কাজ করতে হবে। এর বেশি কিছু বলতে চাই নে আজ। কালকে হয়তো আপনারা এ কথা ভুলেও যেতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে আমি খুব ভালো করে বলেছি। এইটুকুই যদি আমার পুরস্কার হয় তবে আমি বঞ্চিত হলাম। আমি আজ যা বলছি তা আমার প্রাণ দিয়ে, আয়ুক্ষয় ক'রে। আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি

নিশ্বাসে। এর পরিবর্তে আমি চাই সত্যিকার কর্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্যে যারা ব্রতী তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য-রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন। আমার স্বল্পাবশিষ্ট নিঃশ্বাস ব্যয় করে এ কথা বলছি— আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতিলাভের জন্যে কিছু বলছি না— দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে। এই ব'লে আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

বাংলাদেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের খেত দিয়েছে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরছি— কার কাছে। সেই খেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর-কোনো উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন। এ দেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চির দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহুবিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জনসংখ্যা মাথা গ'ণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য থাকে না। প্রভুমুখপ্রত্যাশী জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারি নে। বড়োকে ছোটো করতে চাই। একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে-সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায় সেইগুলিই প্রবল হয়। গড়ে তোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে

ঠেলে বাঙালিকে কেবলি কোণ-ঠ্যাসা করছে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ— যারা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলই তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলই খাটাচ্ছি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালি শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না। ছিল সে যন্ত্রজীবী। মাড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরও বড়ো যন্ত্রের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার করে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাষ করে মরছি— মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসল।

তখন থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম-চালনায়। ঐ একটিমাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে আপিসের বড়োবাবু হবার রাস্তায়। সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর-কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে; তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।'

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিঁকতে পারব।

এ কথা মানি— যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো

সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদ্‌কে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুর-গাছ, তালগাছ বিধাতার দান; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারে নি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সবচেয়ে তার বাধা ঘটছে কোন্‌খানে। যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্য-কালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মতো অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মতো আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্মী আনাতে হচ্ছে যন্ত্রদক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত দুটো এবং তার মন না চলে দ্রুতগতিতে, না চলে নিপুণ-ভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলাদেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গ-বিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে-কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে,

সক্ষম হতে হবে— মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মতো কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাংলাদেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড়ো ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয় নি ; তাই সেগুলি চলছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থর-গমনে। মন তৈরি করে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথমে যে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ করেছে সে হল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যাবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব-শেষে বাংলাদেশে এসে পৌঁছল। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে-খড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য জানেন কী করে মার বাঁচানো যায়— সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি— সে হল হাতিয়ার-বিদ্যার পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল।

বোম্বাই প্রদেশে এ কথা বললে ক্ষতি হয় না যে,'চরখা ধরো।' সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটিমাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলাদেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে,অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছি— তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে

পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে শুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানব যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয় তবে আর-কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত করে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

যাই হোক, বাংলাদেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল 'মোহিনী' মিল; একে একে আরও কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেছে।

এদের যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে— বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাব তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে ব'লে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেইজন্য বাঙালির দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহরক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে তাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কিরকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আমাদের সামনে

আনতে হবে। কলকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্নদ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালি যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

অবশেষে উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত কারখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করছে, তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলাদেশের তাঁতিদের কেন নির্মম হয়ে মারি। বাঙালি দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতি সুতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব করে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তা হলে কী প্রমাণ হবে। তা ছাড়া কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ যে যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র। সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলাদেশের বহু যুগের শিক্ষা-প্রাপ্ত গরিবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি জোর করেই বলব, পুজোর বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতি যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।

অবশ্য, সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তা হলে মিলের কাপড় কিনতে

হবে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলাদেশের বাইরে না যাই। যাঁরা শৌখিন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তাঁরা কেন যে তার চেয়ে অল্পদামে তেমনি শৌখিন শান্তিপুরি কাপড় না কেনেন তার যুক্তি খুঁজে পাই নে। একদিন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড়ো বজ্র হানলে। যে হাত তৈরি হতে কতকাল লেগেছে সেই হাতকে অপটু করতে বেশি দিন লাগে না। কিন্তু স্বদেশের এই বহুকালের অর্চিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে কি কারও ব্যথা লাগবে না। আমি পুনর্বার বলছি, কাপড়ের বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল যতটা, বিলিতি সুতো সত্ত্বেও তাঁতের কাপড়ে তার চেয়ে স্বল্পতর। আরও গুরুতর কথা এই যে, আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলা শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদনশক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাঁতিকে অনুনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিন্তু যদি না পৌঁছয়, তবে বাঙালি তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লৌহযন্ত্র ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

আশ্বিন ১৩৩৮

শিক্ষার বিকিরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

…এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এক কালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্টপরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয় নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ্।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরু-শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা— দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই— যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।' যাত্রী বললে, 'সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল।' দ্বারী বললে, 'ঐ-যে তোমার কাপড়ের নীচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা ষোলো-আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।' এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্‌সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব-কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ

ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে— মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য-সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো বা করুণকণ্ঠে কখনো বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন-যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে

বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন, শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়াকাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ-অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্তই বদ্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও

গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনও দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এসিয়ার মরুভূমিতে যে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালিচাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু শুষ্ক রসনা মেলে, লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিতসমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকট-সংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর; ধূ ধূ করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে

নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজল-মিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ; আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজার-বার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্তজলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে, যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে-নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখ-ধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের

ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে ; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তারও প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল ; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে ; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্তজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।...

১৯৩৩

জলোৎসর্গ

ভুবনডাঙায় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কথিত

আজকের অনুষ্ঠানসূচীর শেষভাগে আছে আমার অভিভাষণ। কিন্তু যে বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হল তার পরে আমি আর কিছু বলা ভালো মনে করি না। সেগুলি এত সহজ, এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর যে, তার কাছে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল উৎসের মতো উৎসারিত।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা ব'লে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই, যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন— যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্য-ক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত, মলিন, রুগ্ন, উপবাসী। ঋষি বলেছেন— হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য করো। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য -দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।— জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃশ্য-লাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে। নিজের চারি দিককে অমলিন অন্নবান্ অনাময় করে রাখতে পারে না যে বর্বরতা, তা রাজারই হোক আর প্রজারই হোক, তার গ্লানিতে সমস্ত দেশ লাঞ্ছিত। অথচ একদিন দেশে জল ছিল প্রচুর আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলায় কবরস্থ মৃত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে, আর তাদেরই প্রেত মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ দেশের সঙ্গে আপন প্রাণাত্মবোধের পরিচয় আজও ভালো

করে দিল না। অন্য সকল লজ্জার চেয়ে এই লজ্জার কারণকেই এখানে আমরা সব চেয়ে দুঃখকর বলে এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণান্তিক বেদনা সম্বন্ধে দেশের চেতনার উদ্রেক হয়েছে। ধরণীর যে অন্তঃপুরগত সম্পদ্, যাতে জীবজন্তুর আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনার গোড়ায়, এই সহজ কথাটি স্বীকার করবার শুভদিন বোধ হচ্ছে আজ অনেক কাল পরে এসেছে।

যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে —তাই মন্ত্রে আছে : আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরের পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত থেকে মধ্যাহ্নরৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ দান!

অথচ বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার-অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য-অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন,

অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদের জল দান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।

সেই ভুবনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিখ্যাত লর্ড্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পূর্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্তি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্যে নিঃসন্দেহ তাঁর কাছে যেতুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তিসমবায়ের দ্বারা এই-যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরও বেশি। এইরকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এখানে ক্রমে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চার দিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমূর্তি ধারণ করেছিল। আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। বন্ধুরা অনেকে অক্লান্ত যত্নে নানাভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শক্তির অনুপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক খর্ব করতে হয়েছে। আয়তন এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোখ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরূপ গ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হল।

এই জলপ্রসার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আভায় রঞ্জিত হয়ে নূতন যুগের হৃদয়কে আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিহৃদয় থেকে একে অভ্যর্থনা করছি। এই জল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত করে শস্যদান করুক। এর অজস্র দানে চার দিক স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

৭ ভাদ্র ১৩৪৩

সম্ভাষণ

শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য যে, আমি কীভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।

আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে

করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কীভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর—যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে। পল্লীজীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি। সেবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে যখন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি হল তখন আমাকে তাঁরা তাঁদের গোলযোগের মীমাংসার জন্য সভাপতির পদে বরণ করেছিলেন। আমার অভিভাষণ শুনে দুই পক্ষই আমার খুবই প্রশংসা করে বললেন,

আপনি ঠিক আমাদেরই পক্ষের কথা বলেছেন; আমি কিন্তু জানতাম, আমি কারুর কথাই বলি নি। আমার জীবনের মধ্যে পল্লীগ্রামের দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, বিচলিত করেছিল, আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।

আমার অন্তর্নিহিত গ্রামসংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত তখন দু ধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে। ভেবেছি এই যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে। পারব না একে কখনও উত্তীর্ণ হতে? সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল; যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন, তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব। এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, করুণা করেন নি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্যের ভিতর। আবার মনে হল মহর্ষির সাধনস্থল শান্তিনিকেতনে যদি

ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়তো হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন— মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও— এদের যদি খুশি করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিচিত্ত এই নূতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ-সাতটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না, কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেছি, নানা গল্প ও কাহিনী রচনা করে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি, তাদের চিত্তকে সরস করবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার যা-কিছু সামান্য সম্বল ছিল তাই নিয়ে এ কাজে নেমে পড়েছিলাম। তখন এমন কথা মনেও আসে নি যে, কত বড়ো দুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বর যখন কাকেও কোনো কাজের ভার দেন তখন তাকে ছলনাই করেন, বুঝতে দেন না যে পরে কোথায় কোন্ পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবতাও আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে ক্রমশ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন দুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন যে, আর সেখান থেকে ভীরুর মতো ফেরবার সম্ভাবনা রইল না। এখন আমাকে এই বিরাট এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোনো উপায় নেই আর তাকে অস্বীকার করবার।...

আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন ; আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে— আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাড়ানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে

হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই— আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনও আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না —এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্রনারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি গদ্যে পদ্যে ছন্দে অনেক-কিছু লিখেছি, তার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি নে, বুঝি নে, পল্লী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানি নে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। তার পর এ কাজ একার নয়। এই কর্ম বহু লোককে নিয়ে। বহু লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্য-রচনা একলার জিনিস, সমালোচনা তার দূর হতেও চলে। কিন্তু এই-যে ব্রত, এই-যে কর্মের অনুষ্ঠান, যা আমি গড়ে তুলছি, যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি— তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ

দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।

এই-যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি, এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়?… আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাব্য-আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়। তাই এখানে আজ বার বার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন— তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩

অভিভাষণ

বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত

পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না, তেমনি বাধাও দেয় না। বকশিশ যখন জোটে নি বকশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন-মনে। সে যুগে যশের হাটে দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্বল্প। আজকের দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা আমার পক্ষে ছিল ভালো, কলমের উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ। পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর পথ দেখাতে পারে না— অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে— সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পৌঁছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অন্তত আমাদের ঘরে পৌছয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে। আমার মরাইয়ে আজ যা-কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অঙ্কুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলার চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন-মনে। অঙ্কুরিত না হলে সে বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের খেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাই নি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

একসময়ে অঙ্কুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে-ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে, স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে। পুব দিকে বটগাছ, ছায়া পড়েছে তার পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যাস্তের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি

করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সেই সময় অকস্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিলুম ডেঙ্গুজ্বরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের স্নিগ্ধ শ্যামল আতিথ্য আমায় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া; ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নৌকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যে-সব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়। পুকুরে আসত-যেত যারা সেই-সব পল্লীবাসী-পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে এক রকমের চেনাশোনা হল— নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে— ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চাম্‌চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ।

আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারি দিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস ; সেখানকার মানুষ যারা— সাঁওতাল— সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন— অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না— 'ওই কবি আসছেন' 'ওই রবিঠাকুর আসছেন' ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা, তাদের সঙ্গে একান্ত হৃদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে— সম্ভব ছিল তখন। ভয় করে নি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের চেহারা এর। পল্লীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম। এ দেশের এক নূতন দৃশ্য— শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে, অন্যসময়

থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এড়িয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা, কী করে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ থেকে। যেন উপলক্ষটা কিছুই নয়, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উপায়। কিন্তু এই উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন ; তীর্থ সম্পূর্ণ-রূপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম্-টেব্ল্ নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল' তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। শীর্ষদেশে হিমালয়, পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর —এ-সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্ল্যাক্‌বোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম, কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬

১

শান্তিনিকেতন

আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা। আশ্রমের একটা উৎসবের উপলক্ষ ফাঁক পড়ে গেল। মানুষ তার দিনগুলির উপরে নানা কারুচিত্র বুনে দিতে চেয়েছে, অন্তত আমাদের দেশে। তার কারণ, আমাদের দেশে অবকাশ ছিল বেশি— সেই অবকাশটাকে একেবারে ফাঁকা রাখতে মন যায় না। প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘোরো কাজে যেটুকু স্রোত বয় তাতে শেওলা জ'মে পাঁকের সৃষ্টি করে, তাতে আপন আপন খুচরো স্বার্থের জঞ্জাল ভেসে আসে। সেইজন্যে আমাদের মতো কঠোরসাধনাহীন গ্রাম্য দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণের দরকার হয়েছিল। সেই পার্বণে সর্বসাধারণের যোগ, আতিথ্যের অজস্রতা, আর সেইসঙ্গে কোনো-না-কোনো দেবতার কল্পনায় মানুষ এক রকম করে অনুভব করতে পারে জগতে এমন কোনো চিরন্তন সত্য আছে যা সংসারের সমস্ত সংকীর্ণতা ও অকিঞ্চনতার উপরে। অলস দেশের মানুষকে এইরকম ভাবের টানে খানিকটা উপরের দিকে টেনে রাখে। নইলে অবসাদের পাঁকের মধ্যে তার টিকি পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। শীতের দেশে মানুষের উদ্যমের সচ্ছলতা প্রচুর— সেখানে তারা চারি দিকের প্রকৃতির সঙ্গে কেবলই লড়াই করে চলেছে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা-কিছু সম্পদ লুকোনো তা তাদের করে নিতে তারা অহোরাত্র প্রবৃত্ত। নিজের দেশকে সমাজকে তারা কিরকম ঐশ্বর্যবান করে তুলেছে সে তোমরা চোখে দেখে এসেছ— এখনও জলে স্থলে আকাশে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলবার চেষ্টায় তাদের বিরাম নেই। সেইজন্যে ঘরের কোণে গ্রামের ছায়ায় সময়টাকে কোলে করে

নিয়ে অনুষ্ঠানের কাঁথা বোনবার প্রবৃত্তিই তাদের হয় না। তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের কাজকেও বড়ো কাজ করে তুলেছে; তাতে তুচ্ছতা নেই, তাতে বৃহৎশক্তি ও ব্যাপক বুদ্ধির দরকার। আজ আমরা দেশ-উদ্ধার-কল্পে যখন কাজের কথাও ভাবি তখনও চরখার ঊর্ধ্বে মনের সাহস পৌঁছয় না। চরখায় কিছু ভাববার দরকার হয় না, বহুকাল আগে যা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে তাকে বিচারহীন অধ্যবসায়হীন মন নিয়ে নিরন্তর চালিয়ে গেলেই হল। কোনো নিরলস বীর্যবান্ দেশে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করাই অসম্ভব হ'ত— কিন্তু এ দেশে এর চেয়ে কঠিন প্রস্তাব উত্থাপন করলেই সেটা একেবারেই বর্জিত হ'ত। মনে করো মহাত্মা যদি বলতেন প্রত্যেক চাষীকেই এক বিঘা জমিতে অন্তত দুই সের ফসল বেশি ফলাতে হবে এই তার সাধনা হওয়াই চাই, এই তার পুণ্যকর্ম— যে পরিমাণে এটা সফল হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশের যথার্থ পরিত্রাণ— তা হলেই তর্ক উঠত এতে যে বুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই, উদ্যম চাই, প্রকৃষ্ট পন্থার প্রতি শ্রদ্ধা চাই। হাঁ, তা চাই, তা চাই ব'লেই তার দ্বারাই দেশে মুক্তি সম্ভবপর হতে পারে, মূঢ়চিত্তের ক্ষীণ উদ্যমের দ্বারা দেশ জাগতেই পারে না। দেশের বারো আনা লোক চাষী, তারা আরও ভালো করে চাষ করবে এ কথা না বলে তারা জড়যন্ত্রের মতো চরখা চালাবে এ উপদেশ মানুষের অবমাননা। অবশ্য, এই চাষের উন্নতির কথা বলার মানেই এই উদ্দেশে দেশব্যাপী ব্যবস্থা করা। চরখার জন্যে খদ্দরের জন্যে যে ব্যবস্থার চেষ্টা চলেছে এ তার চেয়ে বড়ো জাতের চেষ্টা। এর জন্যে চাষীদের মধ্যে ফসল-উৎপাদনের সমবায়প্রণালী প্রবর্তন করতে হবে, প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভাণ্ডার স্থাপন করতে হবে, জমির প্রকৃতি-পরীক্ষার ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। দেশে একদিন চরখা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চলত (বিদেশেও চলত), স্বাভাবিক

কারণেই তা বন্ধ হয়ে গেছে— আজ বাহ্য উত্তেজনা -দ্বারা সেই চরখা কিছু পরিমাণে চলতেও পারে, কিন্তু আবার তা বন্ধ হয়ে যাবে। তার কারণ, এ জিনিসটা এখনকার কালের সঙ্গে একেবারেই সংগত নয়। অথচ সমবায়-প্রণালীতে কৃষির উন্নতি-চেষ্টা যদি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করা হয় তবে যতটুকু পরিমাণেই সেই চেষ্টা সফল হবে ততটুকু পরিমাণে সেই সফলতা স্থায়ী হবে এবং ক্রমশই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, কেননা এইটেই বর্তমান কালের সঙ্গে সংগত। খদ্দরের প্রচার দেশ-উদ্ধারের মুখ্যতম উপায় এই উপদেশবাক্য যে এতটা ব্যাপ্ত হতে পেরেছে তার প্রধান কারণ— ল্যাঙ্কাশায়ারের উপর চাপ দিয়ে বণিক্‌জাতিকে দুরস্ত করে আনবার ইচ্ছেটাই মনের মধ্যে প্রবল আছে। অর্থাৎ দেশ-উদ্ধারের পথ এখনও আমরা বাইরের দিকেই খুঁজছি। এটা অন্তর্গূঢ় পরমুখাপেক্ষিতারই লক্ষণ। স্বদেশীর দিনে যখন বয়কট-ব্যাপারে দেশ মেতে উঠেছিল তখনও লক্ষটা ছিল সেই বাইরের দিকে। অসহযোগিতার প্ল্যান যখন করি তখন জবরদস্তির পন্থায় সহযোগিতা লাভ করবার আশাতেই তা করি। সে চেষ্টাও বহির্মুখী।

হঠাৎ তোমার চিঠিতে এ-সব আলোচনার কী দরকার ছিল তার ভদ্ররকম কৈফিয়ত মনে জোগাচ্ছে না। এ চিঠি তোমার রোগশয্যার উপযুক্ত নয়। আরম্ভ করেছিলুম লক্ষ্মীপূর্ণিমার প্রসঙ্গ তুলে। সেটা অন্যায় হয় নি। আমাদের গ্রাম্যসমাজে ব্রতপূজাপার্বণের কেন এত প্রাচুর্য সে কথাটাও এইসঙ্গে মনে এসেছিল। ভেবেছিলেম বালী দ্বীপের উদাহরণটা এই উপলক্ষে তোমার কাছে পাড়ব, কেননা, সেখানে দেখে এসেছি নিত্য-অনুষ্ঠানের ধারা। বালী আধুনিক জগতের থেকে অনেক দূরে। চাষ ক'রে দিন চলে, ফসল হয় অজস্র, কলকারখানার কোনো সম্পর্কই নেই— জীবনযাত্রার জন্যে কিংবা পোলিটিকাল অথবা অন্য কোনো

আইডিয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি মারামারি নেই। সেইজন্যে এই শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ায় বসে দিনগুলিকে নিয়ে ওরা শিল্পকাজ করছে— তাতে শান্তি আছে, সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বীর্য নেই, জীবনের সার্থকতা নেই। আমাদের সেকেলে বাংলাদেশের সঙ্গে বালীদ্বীপের অনেকটা মেলে। যে দেশে লক্ষ্মীর পুজো হাতে-কলমে করতে হয় সে দেশে লক্ষ্মী-পূজার অনুষ্ঠানটা কারও দরকার হয় না, মনেও আসে না। ছোটো মেয়ে ঘরকন্না করে না বলেই ঘরকন্নার খেলা করে, তোমার মতো মেয়ে পৌত্তলিক বেহাইয়ের সঙ্গে বেয়ানগিরি করতে উৎসাহই বোধ করে না। এখনকার কালের আসল লক্ষ্মীর পূজার মতো প্রকাণ্ড অধ্যবসায়ের ব্যাপার আর কিছুই নেই— পারব কেন! উপযুক্ত উদ্যমের অভাব-বশতই যা যেমন চলছে তাকে তেমনই চলতে দিচ্ছি, আর লক্ষ্মীপূজা করছি, আর চরকায় সুতো কাটাকেই একটা মহদ্‌ব্যাপার বলে প্রচার করা হচ্ছে। এ দেশে এর বেশি কি আর-কিছু কোনোমতেই সম্ভব হবে না? অথচ অন্য দেশের কঠোর সাধনার ফল আমরা এই পথেই লাভ করব বলে নিঃসংশয় হয়ে থাকব? এই-সব আক্ষেপ মনের মধ্যে কানায় কানায় সঞ্চিত হয়ে আছে। সেইজন্যেই কোনো প্রসঙ্গ এর একটু কাছ ঘেঁষে চললেই অমনিই এটা বেরিয়ে পড়ে।

কাল এই পর্যন্ত লিখেই কলম বন্ধ করেছিলুম। ইতিমধ্যে বাদলাটা বেশ রীতিমত উৎসাহের সঙ্গেই ঘনিয়ে এল। এরকম মেঘচ্ছায়াশ্যামল বর্ষণমুখর দিন মোটের উপর আমার ভালোই লাগে। কিন্তু এই সময়টা, মাঠে যখন আউশ ধান কাটবার দিন আসন্ন হয়ে এল, তখন মনের থেকে উদ্‌বেগ কিছুতেই যেতে চায় না। যে দেশে অন্নের বরাত একমাত্র চাষের উপর সে দেশে আকাশের প্রত্যেক ইঙ্গিত নিয়ে মনটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। অন্য দেশে বাঁচবার পন্থা অনেকগুলো, আর সেগুলো বড়ো-বড়ো রাজপথ—

পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। ভারতবর্ষে একটিমাত্র সংকীর্ণ গলি, তার এধারে মরণ ওধারে মরণ। তাই প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে সব-প্রথমে আমি weather reportটা দেখে নিই। য়ুরোপ জীবিকার জন্যে তাকায় ভূগর্ভের খনির দিকে, আমরা তাকাই আকাশের পানে। ভূগর্ভের দিকে খন্তা চলে, আকাশের দিকে মন্ত্র। ২ কার্তিক ১৩৩৬

[১৯ অক্টোবর ১৯২৯]

২

মস্কৌ

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি ; তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না ; কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম ক'রে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না ; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান

হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি— অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।...

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা-সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত— ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম! শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়— মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে— সায়ন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো ভালো অপেরা ও বড়ো বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই— ইংলণ্ডের মজুর-শ্রেণীর

সঙ্গে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারী উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি— কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী হ্যারি টিম্বর্‌স্‌ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে— আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে— আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে— গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে। কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনও টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না— গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।··· কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া ক'রে এইটে ঘোচানো চাই। সমবায়প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হবে ; তার পরে শারীরবিজ্ঞান।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম ; ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক দল স্বাস্থ্য, এক দল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা রকম তদারকের দায়িত্ব নেয়, কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই-সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি— কেবলই নিয়মাবলী-রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ— অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই— আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ-বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই— নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

৩

[বর্লিন]

বর্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে, সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কিরকম উৎসুক হয়ে উঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা— ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক ব'লে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হলে সব-আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে

উপলব্ধি করেন না। এইরকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ। কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক, এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহূর্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি— শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে ব'লে-ক'য়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত

হয়েছে— জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায় খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, 'আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে!' আমি যদি বলতে পারতুম এ ভার আমিই নেব, তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী! এমন কাজের চালনা-ভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব; সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগে ছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি

এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে— শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌছতে পারে না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এইজন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা, ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের কাছেও সহজ কাজ, এমন-কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ— তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরানি তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক্‌রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের

কাজ কংগ্রেসের পান্‌ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা-উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে-বাঁধা হাত দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহুকোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম সমাজের একটা চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনো-কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না; কারণ, যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাই নে তাদের জন্যে যে কিছুই করা যেতে পারে এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

৪

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন- উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না ব'লে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

এইসঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করি নে যে, গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা বুদ্ধি বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত— বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে, যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

ইংলণ্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম লণ্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি-নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত-ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জন-দশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায়প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনি গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা- উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।

তার প্রধান কারণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল সে যন্ত্র অন্ধ, বধির, উদাসীন। তা ছাড়া হয়তো এ কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই; যারা দুর্বল, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাদের দুর্বল। নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভুশ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না। স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।

রুশীয় গল্পের বই পড়ে জানা যায়, সেখানকার বহুকাল-নির্যাতন-পীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই দুঃসাধ্য হোক, আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে শোধন করে নিতে হবে। সমবায়প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।

১৩৩৭

৫

শান্তিনিকেতন

হাসি পায় মনে করলে যখন ভাবি এই সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রনেতারা সমস্ত দেশ জুড়ে বক্তৃতামঞ্চে কংগ্রেসের উত্তেজনা বিস্তার করে বেড়াচ্ছেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কারও মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু কী স্তূপাকার অবাস্তবতা, কৃত্রিমতা! এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের অনৈক্য কেবল ভাষাগত নয়, স্থানগত নয়, মজ্জাগত। পরস্পরের মানবসম্বন্ধ কেবল যে শিথিল তা নয়, অনেক স্থলেই বিরুদ্ধ। আমরা ভোটের ভাগ-বিভাগ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়েছি, যেন অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও ভোটের সামঞ্জস্যে এই ফাটল-ধরা দেশের সর্বনাশ নিবারণ করতে পারবে। আজকাল আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিকভাবে দেখবার চেষ্টা করি। মরবার কারণ যেখানে আছে সেখানে মরা অনিবার্য —এর চেয়ে সহজ কথা কিছুই নেই। পার্লামেণ্টারি রাষ্ট্রতন্ত্র! এ কি বিলিতি দাওয়াইখানা থেকে ভিক্ষে করে আনলেই তখনই আমাদের ধাতের সঙ্গে মিলে যাবে? নিউইয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমাটির উপর বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে। সাদা কাগজের মোড়কে আমাদের ভাগে কী দান কী পরিমাণে এসে পৌঁছল সেটা বেশি কথা নয়, যাকে দেওয়া হচ্ছে তারই পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে গিয়ে কতটা টেঁকে সেইটেই ভাববার বিষয়। হয়তো ইংরেজের এই দানের সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিও আছে। জগৎ জুড়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণিবাতাস জেগে উঠছে তাতে ভারতবর্ষের মন না পেলে ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব হতে পারে না। যাই হোক, লুব্ধতা স্বভাবে প্রবল থাকলে সুবুদ্ধির দূরদর্শিতা কাজ করতে পারে না। আমার নিশ্চিত

বিশ্বাস য়ুরোপের অন্য যে-কোনো জাত, এমন-কি আমেরিকান, কর্তা হলে ভারতবর্ষের গলার ফাঁসে আরও লাগাত জোর— নিজেদের নির্মম বাহুবলের 'পরেই সম্পূর্ণ ভরসা রাখত। আমাদের তরফে একটা কথা বলবার আছে, ইংরেজের শাসনে যতই দাক্ষিণ্য থাক্‌, আজ পর্যন্ত না মিলল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা, না জুটল যথেষ্ট পরিমাণে পেটের ভাত, না ঘটল স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করতেই পুঁজি শেষ হয়ে আসে, প্রজাদের মানুষ করে তুলতে হাতে কিছুই থাকে না। এই ঔদাসীন্য আমাদের শতাব্দী ধরে হাড়ে মজ্জায় জীর্ণ করে দিলে। আমাদের পাহারা আছে, আহার নেই, এমন অবস্থা আর কতদিন চলবে— অথচ ওদের নিজের দেশে প্রজার অন্নাভাব সম্বন্ধে ওদের কত চিন্তা কত চেষ্টা! কেননা, ওরা ভালো করেই জানে— আধপেটা অবস্থায় কোনো জাতের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। আমাদের বেলায় সেই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ওরা ছোটো করে নিয়েছে, তারই নির্মমতা আমাদের সুদূর ভাবীকালকে পর্যন্ত অভিভূত ক'রে রেখেছে। তাই মনে হয়, নিজেদের স্বভাবগত সমাজগত প্রথাগত সকল প্রকার দুর্বলতা সত্ত্বেও, নিজের দেশের ভার যে করেই হোক নিজেকেই নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর করে থাকলে দুর্বলতাই বেড়ে চলে, তা ছাড়া ইতিহাসের আবর্তমান দশাচক্রে অনন্তকাল ইংরেজের শাসন অচলপ্রতিষ্ঠ থাকতেই পারে না।

নিজের ভাগ্য নানা ভুলচুক নানা দুঃখকষ্ট-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই। সেই শিক্ষার আরম্ভপথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি -অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম।

য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়— চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ

হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা— ব'লে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি— না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার— ওই গ্রামের কাজে। এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন, অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল —এ কথা আমি বার বার বলেছি। আজ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস জাতিসংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিললে অনতিবিলম্বে মাথা-ঠোকাঠুকি ক'রে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না। আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু এই কথা মনে রেখো, পাবনা কন্‌ফারেন্স্ থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। আর, শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে— ফলের কথা আজ কে বিচার করবে? ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩৪

গ্রন্থপরিচয়

··· আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা— ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।···

যখন এ কথা কাউকে ব'লে-ক'য়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস।

—রাশিয়ার চিঠি, পত্র ৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'যৌবনের আরম্ভকাল'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন— সে সময়ে এ দেশে স্বাদেশিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি প্রধানত এরূপ যে, এমন কথা তীব্রস্বরে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছে যে, 'দেশ-হিতকর কার্যে'র অর্থ 'আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরিব অনাথদের পরিত্রাণ' ; 'দেশের লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে, অলংকারশাস্ত্র-সম্মত কাল্পনিক অশ্রুজল নহে, মনুষ্যচক্ষু-প্রবাহিত লবণাক্তজল-বিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায়, যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবলমাত্র শ্রোতৃবর্গের

করতালিবর্ষণে তাঁহাদের সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন।' 'আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের স্বদেশের উপর প্রেম এত অত্যন্ত বেশি যে স্বদেশের "লোকের" উপর প্রেম আর বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইঁহারা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীর হিতসাধনে সময় পান না। ··· যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে-কলমে এক-একজন করিয়া দেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক নাগরিকমহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোক বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যপীরের গান করিতে আসিয়াছেন সেই যখন বিপদের সময় অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনোকালে বিনাশ নাই।··· আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা agitate করিতে যাইব?'[১]

'স্বজাতির প্রতি যাহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই তাহাদের "স্বদেশ" জিনিসটা কী জানিতে কৌতূহল হয়'— 'ইতিহাস-পড়া স্বদেশ-হিতৈষিতা এমনিতর একটা ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া'— এই মর্মের কথা এই পর্বে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাতেই কথিত হইয়াছে— বস্তুত পরিণতবয়সে তিনি দেশহিতকর্মের যে আদর্শ ও পদ্ধতি লোক-

সমক্ষে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মূল কথাগুলি প্রথমযৌবনের এই-সকল রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়।

১৮৯০ সালে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়— এতদিন যে 'স্বদেশের লোক' 'স্বজাতি'কে অনেকটা তত্ত্বতঃ জানিতেন, এখন প্রত্যহ তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিল, ইহাদের জন্য 'হাতে কলমে' 'একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি' যথাসাধ্য তাহার ক্ষেত্র রচনা করিয়া চলিলেন। এই-কালে পল্লীর জীবনে মানবসম্বন্ধের যে বৈচিত্র্যের পরিচয় লাভ করিলেন তাহার সাহিত্যরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে 'গল্পগুচ্ছে'; 'গ্রামের হৃদয়' যাহাতে ভাষা পাইয়াছে তাহার আলোচনা বিধৃত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে; লোক-শিল্পের প্রতি যে ঐকান্তিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহার নিদর্শন ছড়াইয়া আছে নানা চিঠিপত্রে। আর, পল্লীর মানুষের ঐহিক দুঃখবেদনার সহিত ক্রমশ যে পরিচয় হইতেছে তাহার আভাস পাই 'ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকখানি চিঠিতে (১৮৯১-৯৪)। এখানে সেগুলি উদ্‌ধৃত হইল—

সাজাদপুর। ২০ মাঘ [১৮৯১]

... এই-সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষা-ভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন— কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়।

শিলাইদহ। ১০ মে [১৮৯৩]

··· আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে— এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো— নিরুপায়— তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্‌, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিষও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই— তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন!

শিলাইদহ। ১১ মে [১৮৯৩]

··· এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে। এইমাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল— সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি

দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিষ নয়। এদের চাষার ভাষা, এদের স্নেহের সম্বোধন এমন মিষ্টি লাগে! ছোটো ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো! কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে! শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থিরবিশ্বাসপূর্ণ একাগ্র নিষ্ঠা নেই। আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য! মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল-ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে— তা ছাড়া জমিদার হয়ে যা করতে পারি তা তো করবই।

শিলাইদহ। ৪ জুলাই ১৮৯৩

... আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে— আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারছিস। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিষটা কোনো-এক জায়গায় আছে অবিশ্যি, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে— কিন্তু সেটা যে ঠিক

কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত— এই শতসহস্র নির্দোষী হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না— বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে, কিছু বোঝবার জো নেই।

কলকাতা। ২১ অগস্ট্‌ [১৮৯৩]

… আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্‌-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি— এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে— তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে— অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য -সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি ব'লে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এনৃছাপ নিতে গিয়েছিলুম। তা সে বললে, আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস্‌।

তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম ব'লে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা করে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম ক'রে ভিন এলাকায় গিয়েছিলুম।' কিন্তু তবু তার এমনি ভক্তি যে সেই ভিন এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি করে ভোগ করছিল ব'লে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায়, সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধান-সুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, 'আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না!' এই ব'লে সে চোখ থেকে দুই-এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। তুই যদি তাকে দেখতিস, তার কথা শুনতিস, সে যে কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরি না ক'রে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা বলে গেল, তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারতিস। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না।··· সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।

পতিসর। ২১ মার্চ [১৮৯৪]

··· এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে— এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না— এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই ব'লে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিলুম একজন প্রজা এসে বললে 'একটু খাড়া হও তুমি'— আমি কিছু আশ্চর্য

হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে, 'আমার জনম সার্থক হল।' সে বললে তার কাশি এবং জ্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস ক'রে) ছিল, আজ অন্ন পথ্য করে আমার পদধূলি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গুণে আমার পায়ের ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে। ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে— আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে।

দিঘপতিয়া জলপথে। ২০ সেপ্টেম্বর [১৮৯৪]

... পদ্মার ও দিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এ দিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল-খাল নদী-নালা কত রকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের খেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্‌সর্‌ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে— সেখানে আর ধান নেই— নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পড়ে— সেখানে এক তীরে ধানের

ক্ষেত, আর-এক তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম— মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে— স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে— ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে— তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক-হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার— তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির হয়ে জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্ ভন্ করতে থাকে— এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে— এর উপরে প্রতি

ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না— একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত— এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই এবং সুবিধেও নেই।

—ছিন্নপত্রাবলী

এই চিঠিগুলি লিখিবার সমকালে বিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার রচনা (রামপুর বোয়ালিয়া, ২৩ ফাল্গুন ১৩০০)— পল্লীর মানুষের, দেশের বিশাল জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য অভাব ও হতাশার কী পরিচয় তিনি পাইয়াছেন, সেই-সব 'মূঢ় মূক ম্লান মুখে' কী ভাষা দিতে আর 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' কী আশা জাগাইতে অন্তরের অন্তরে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, কাহারও না জানিবার কথা নয়।[২] এই সময়ে তিনি জমিদারিতে পল্লীর উন্নতি-কল্পে যে প্রয়াস করেন নিম্নমুদ্রিত রচনাংশে এবং চিঠিপত্রেও তাহার আভাস পাওয়া যায়—

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে

চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ কলেজে পাশ করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল ; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে-সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক [রথীন্দ্রনাথ] বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল ; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়।

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৩৫৮)

প্রিয়সুহৃদ্‌ জগদীশচন্দ্র বসুকে এক পত্রে এই-সকল পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখিতেছেন (শিলাইদহ, কুমারখালি, ১০ আষাঢ় ১৩০৬ [১৮৯৯])—

আমার চাষবাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম— তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোনো অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।

—চিঠিপত্র ৬

পল্লীর উন্নতিকল্পে রবীন্দ্রনাথ এই সময় নানা কল্পনা ও পরীক্ষায় উৎসুক, রেশমের চাষের চেষ্টায়ও তিনি এই সময় যুক্ত হইয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে পূর্বোল্লিখিত পত্রে (১৮৯৯) তিনি লিখিতেছেন—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ-বারো-জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা-আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে— লরেন্স্ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীটসেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ-বার করিয়া টানাটানি করে— প্রায় পাগল করিয়া তুলিল।··· এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

—চিঠিপত্র ৬

‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’এর পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

লরেন্স্কে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলাদেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো-এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইঁট পাথর ভেঙে

নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না— তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না ; সমস্তই গেল ভেসে ; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর-একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে ; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স্‌ বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার

অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৩৪৮)

জমিদারির ভার লইয়া পল্লীবাসীর নানা দুর্দশা যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিলেন তাহার পরিচয় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে পরবর্তীকালে তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসেও (প্রবাসী ১৩১৪-১৬)।[৩] এখানে তাহার দু-একটি অংশ সংকলনযোগ্য; কেননা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে নিজে যাহা দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, তাহাই গোরা'র অভিজ্ঞতা চিন্তা চেষ্টা ও বেদনা রূপে বর্ণিত ইহাতে সন্দেহ নাই।—

ভদ্রসমাজ, শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা-সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল; সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন; প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত; পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত; তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কারমাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চল-ভাবে কঠিন; তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ, তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনোমতেই কল্পনা করিতে পারিত না। গোরা গ্রামে বাস করিবার সময় একটা পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল। এত বড়ো একটা সংকটেও

সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি যে তাহাদের কত অল্প তাহা দেখিয়া গোরা আশ্চর্য হইয়া গেল। সকলেই গোলমাল দৌড়াদৌড়ি কান্নাকাটি করিতে লাগিল কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে কিছুই করিতে পারিল না। সে পাড়ার নিকটে জলাশয় ছিল না; মেয়েরা দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া ঘরের কাজ চালায়, অথচ প্রতিদিনেরই সেই অসুবিধা লাঘব করিবার জন্য ঘরে একটা স্বল্পব্যয়ে কূপ খনন করিয়া রাখে সংগতিপন্ন লোকেরও সে চিন্তাই ছিল না। পূর্বেও এ পাড়ায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়াছে, তাহাকে দৈবের উৎপাত বলিয়াই সকলে নিরুদ্যম হইয়া আছে, নিকটে কোনোপ্রকার জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কোনোরূপ চেষ্টাই জন্মে নাই। পাড়ার নিতান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য অসাড় তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের আলোচনা করা গোরার কাছে বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। সকলের চেয়ে গোরার কাছে আশ্চর্য এই লাগিল যে, মতিলাল ও রমাপতি এই সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না বরঞ্চ গোরার ক্ষোভকে তাহারা অসংগত বলিয়াই মনে করিত। ছোটোলোকেরা তো এই রকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই-সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না; ছোটোলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।…

—গোরা। অধ্যায় ২৩

যতই ইহাদের ভিতর প্রবেশ করিল ততই একটা কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে দেখিল, এই সকল পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক ঘরের খাওয়াদাওয়া শোওয়াবসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষবিহীন চোখের উপরে দিনরাত্রি রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস— সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো তর্কমাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারে নিষ্ঠায়, ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায়, আত্মহিতবিচারে-অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া আর-কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। দণ্ডের দ্বারা দলাদলির দ্বারা নিষেধটাকেই তাহারা সব চেয়ে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে ; কী করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদমস্তক জালে বাঁধিয়াছে— কিন্তু এ জাল ঋণের জাল, এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন, রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে এই আচারের অস্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে। কতবার সে দেখিয়াছে সমাজে ক্রিয়াকর্মে কেহ কাহাকেও দয়ামাত্রও করে না। এক জনের বাপ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতেছিল, সেই বাপের চিকিৎসা পথ্য প্রভৃতিতে বেচারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে— সে সম্বন্ধে কাহারও নিকট হইতে তাহার কোনো সাহায্য নাই— এ দিকে গ্রামের লোকে ধরিয়া পড়িল তাহার পিতাকে অজ্ঞাতপাতকজনিত চিররুগ্নতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে হতভাগ্যের দারিদ্র্য অসামর্থ্য কাহারও অগোচর ছিল না, কিন্তু ক্ষমা

নাই। সকলপ্রকার ক্রিয়াকর্মেই এইরূপ। যেমন ডাকাতির অপেক্ষা পুলিস-তদন্ত গ্রামের পক্ষে গুরুতর দুর্ঘটনা, তেমনি মা-বাপের মৃত্যুর অপেক্ষা মা-বাপের শ্রাদ্ধ সন্তানের পক্ষে গুরুতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। অল্প আয় অল্প শক্তির দোহাই কেহই মানিবে না— যেমন করিয়া হউক সামাজিকতার হৃদয়হীন দাবি ষোলো আনা পূরণ করিতে হইবে। বিবাহ উপলক্ষে কন্যার পিতার বোঝা যাহাতে দুঃসহ হইয়া উঠে এইজন্য বরের পক্ষে সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়, হতভাগ্যের প্রতি লেশ-মাত্র করুণা নাই। গোরা দেখিল এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।

শিক্ষিতসমাজের মধ্যে গোরা এ কথা ভুলিয়াছিল— কারণ, সে সমাজে সাধারণের মঙ্গলের জন্য এক হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি বাহির হইতে কাজ করিতেছে। এই সমাজে একত্রে মিলিবার নানাপ্রকার উদ্‌যোগ দেখা দিতেছে। এই-সকল মিলিত চেষ্টা পাছে পরের অনুকরণরূপে আমাদিগকে নিষ্ফলতার দিকে লইয়া যায় সেখানে ইহাই কেবল ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু পল্লীর মধ্যে যেখানে বাহিরের শক্তিসংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না, সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধর্ম-সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না— যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার

অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানা রকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে জ্ঞানকে ধর্মবুদ্ধিকে কর্মকে এত দিকে এত প্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

—গোরা। অধ্যায় ৬৭

কবি 'নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত' রহিলেন যেমন নিজের জমিদারিতে, 'সম্মিলিত কর্মচেষ্টা'র জন্যও দেশকে তেমনি আহ্বান করিলেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে[৪] (৭ শ্রাবণ ১৩১১ প্রথম পঠিত), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে[৫] (১৩১১ সালের ৭ চৈত্র ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে পঠিত) বলিলেন, 'কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।'— 'নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার' জন্য 'দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহে' তিনি ছাত্রদের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন— 'সাহিত্যপরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি— দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ··· স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন··· মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পাশে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশ-প্রেমকে সার্থক করো।' বঙ্গবিচ্ছেদ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি কায়মনোবাক্যেই যোগ দিয়াছিলেন ; কিন্তু সে আন্দোলন যখন তাঁহার অভিপ্রেত সংগঠনের পথে গেল না, তখন স্বায়ত্ত সীমার মধ্যে নিজের কল্পনাকে যথাসাধ্য রূপ দিতে ব্রতী হইলেন, পুত্র ও পুত্রপ্রতিমদিগকে

কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাইলেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহার আরব্ধ কর্মকে অগ্রসর করিতে পারেন।

এই সময়েও তিনি দেশবাসীকে নিরন্তর নিজ বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন— 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪) লিখিয়াছেন—

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপনি দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষা-দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়; দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে আমরা উভয়ে "ভাই"— তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা "চাষা বেটা" বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেণ্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা।... উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়— সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর-কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা

যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত— তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত— তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।···

তবে করিতে হইবে কী? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে, দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্ব-চেষ্টায় দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনো-প্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিস্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

—সমাজ

যুবকদের বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া এই প্রবন্ধে তিনি বলিলেন—

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে

নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে, এ কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে যে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, শোনো, কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তি-প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পারো খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো-দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো। তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই-সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা করো।... দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন— এই আমাদের সাধনা।

—সমাজ

ইহার পর পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে (মাঘ ১৩১৪। ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) 'দেশের সমস্ত কার্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে... তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ' করিলেন, কর্মসূচীও নির্দেশ করিয়া দিলেন— এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই অভিভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। এই কালে* 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে যে প্রস্তাবসূচী প্রচার করেন এ স্থলে তাহা মুদ্রিত হইল—

পল্লীসমাজ

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লী-সমাজ সংস্থাপন করিতে হইবে। সহর গ্রাম কি পল্লী -নিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায়মত অন্যূন পাঁচজনের উপর প্রতি পল্লীসমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লীসমাজের কার্য করিবেন। পল্লীসমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লীসমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন।

উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্‌ভাব -সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা।

২. সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিসের দ্বারা মীমাংসা।

৩. স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪. উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লীসমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা-সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫. বিজ্ঞান ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি ধর্মভাব একতা স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬. প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ অনাথ অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭. পানীয় জল, নদী নালা, পথ, ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮. আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য বা গোমহিষাদিপালন-দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯. দুর্ভিক্ষনিবারণার্থে ধর্মগোলা-স্থাপন।

১০. গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১. সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২. মিলনমন্দির Club-স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩. পল্লীর তত্ত্ব-সংগ্রহ—অর্থাৎ, জনসংখ্যা, স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি অবনতি, বিদ্যালয় পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রী-সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর) ওলাউঠা বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐ সব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪. জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাবসংস্থাপন ও ঐক্যসংবর্ধন।

১৫. জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লীসমাজের কার্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ সালিসিতে মেটান হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসী মাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে কি মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কার্য নির্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লীসমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি পূজার নাচ-তামাসায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ-সমস্ত অপব্যয় সঙ্কোচ করিলে সেই অর্থ-দ্বারা পল্লীসমাজের কার্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লীসমাজ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

—কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ১৬৩-৬৬

পাবনা সম্মিলনীর কিছুকাল পূর্ব হইতে, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) পর হইতে, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাস করিতেছিলেন, প্রাণপ্রতিম পুত্রের মৃত্যুশোকেও আত্মসংবরণ করিয়া 'গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন' চেষ্টায় ব্রতী। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীকে এক পত্রে লিখিতেছেন—

এখানকার গ্রাম সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা ভাবছি তা এখনো কাজে

লাগাবার সময় হয় নি— এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানার চেষ্টা করছি। ভূপেশ প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করছেন, সেইগুলো ভালো ক'রে জমে উঠলে তখন প্ল্যান ঠিক করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন করতে চাই— সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোটো প্রতিকৃতি খুব শক্ত কাজ অথচ না হ'লে নয়। অনেক ত্যাগের আবশ্যক সেইজন্যে মনকে প্রস্তুত করছি— রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব— তাকেও ত্যাগের জন্য ও কর্মের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজের বন্ধন মোচন করতে না পারলে আর কাউকে মুক্ত করতে পারব না। ২৯ পৌষ ১৩১৪

—পত্র

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও এই সময় গ্রামসেবার কাজের সূচনা হইয়াছে— অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

শিলাইদহ

তোমাদের গ্রামের কাজ ভালো চলছে শুনে আমি ভারী, খুসি হয়েছি। এখান থেকে হরিদাস বলে একটি ছেলে যাবে, সে ঐ কাজে যতীনের বিশেষ সহায়তা করতে পারবে। ২৯ পৌষ ১৩১৪

—পত্র

এই পত্রে উল্লিখিত শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

১৯০৭ সালে আমি আশ্রমে যোগ দিবার পরেই ওখানে গ্রাম সংগঠনের পত্তন হয়। কবি তখন এই সংগঠনের কথা ভাবিতেছিলেন ও দেশকে বলিতেছিলেন, কিন্তু কোথাও বিশেষ সাড়া পান নাই। তাই তিনি আশ্রমের নিকটস্থ ভুবনডাঙা গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য

আমাদের উৎসাহ দিলেন। আমরা ও কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের কাজের এই চারিটি বিভাগ হইল। আশ্রমে ও ভুবনডাঙার মধ্যে একটু সচ্ছল অবস্থার লোকের ঘরে মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি রাখা হইল। ছেলেদের ও অধ্যাপকদের পুরানো কাপড় লইয়া দরিদ্রদের জন্য বস্ত্র-ভাণ্ডার হইল, অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দিবার ভার আমার উপরে পড়িল। অজিতবাবু বঙ্কিমবাবু ভূপেশবাবু সত্যেশ্বরবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের স্বাস্থ্যবিভাগের ভার পড়িল। প্রতিদিন বিকালে জলখাবারের পর কয়েকটি ছেলেকে লইয়া আমি ভুবনডাঙায় গ্রামের ছেলেদের পড়াইতে যাইতাম। আশ্রমের এক-একটি ছেলে গ্রামের এক-একটি ছাত্রের ভার লইত। সেই তাহাকে বাংলা লেখা পড়া ও অঙ্ক শিখাইত। নিয়মিত পাঠের পরে কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা হইত, তাহাতে গ্রামের ছেলেরা আনন্দ পাইত। আশ্রমের মতো গ্রামেও গাছের তলাতেই আমাদের ইস্কুল বসিত। স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে মাঝে মাঝে গ্রামের রাস্তা পরিষ্কার করা হইত। এই গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির পাশে একটা করিয়া খানা ছিল; তাহাতে নানারকম আবর্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ হইত। সেগুলি বুজাইয়া ফেলিবার বা পরিষ্কার করার জন্য আমরা উপদেশ দিতাম। বর্ষাকালে উহাতে জল জমিলে মাঝে মাঝে কেরোসিন তেল দিয়া মশক ধ্বংসের চেষ্টাও হইয়াছে, কিন্তু ফল বেশি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-স্মৃতি। দেশ, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯

এই সময়ে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আরো কোনো-কোনো চিঠিতে জমিদারিতে পল্লীসমাজ স্থাপনের বিবরণ পাওয়া যায়—

[বোলপুর]

·· এখন আমার কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ-স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথ ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে— হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে ক'রে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

যাই হোক, এক দিকে বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং [অ ?] ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করছি।

এমন সময়ে আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন। এ আহ্বান আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুলভাবেই সাড়া দিচ্ছে কিন্তু নিশ্চয়ই জানবেন আমার ক্ষমতা নেই যে আমি অন্য কাউকে কোনো লক্ষ্যসাধনে নিযুক্ত করি। আমি স্বভাবতই leader শ্রেণীর নই। আমার মনে যে চিন্তা আসে সেইটেকে লিখতে পারি এবং যখন দেখি আমার পরামর্শ কেউ কাজে

পরিণত করবার কোনো চেষ্টা করছে না তখন আমি নিজের একক চেষ্টায় সেই কাজ আরম্ভ না করে থাকতে পারি না। কিন্তু অন্য কাউকে তাঁর নিজের শক্তির উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করে দিতে গেলে আমি রাস্তা খুঁজে পাই নে। যাঁরা স্বভাবতই leader তাঁরা মানুষকে উপকরণের মতো ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা প্রত্যেককে তার স্বস্থানে স্থাপন করাতে পারেন, এইজন্য মানুষরা তাঁদের সাড়া পেলে আর স্থির থাকতে পারে না— সার্থকতা-অন্বেষণে তাঁর চার দিকে দেখতে দেখতে জমাট হয়ে বসে। আমাকে সেই দলের লোক বলে ভ্রম করবেন না— আমি লেখক মাত্র— এবং যেটুকু সাধ্য আছে সেই পরিমাণে সাধকও বটে। আপনারা যখন প্রীতিগুণে কাছে আসেন তখন মনে উৎসাহের জোয়ার আসে, যখন দূরে যান তখন নিজেকে অসহায় বোধ হয়। ঈশ্বর যে কলম চালানোর ভার দিয়েছেন তার দ্বারা যদি লোকের হৃদয়ক্ষেত্রে ঢেলা ভেঙে কিছু চাষ দিয়ে যেতে পারি, কিছু বীজ বোনাও যদি সারা হয়, তা হলেই আমার কাজ সাঙ্গ হবে— কিন্তু ফসল ঘরে তুলে মাড়াই করে গোলা পূর্ণ করবার মতো সঙ্গতি আমার নেই— আমি কৃষাণ মাত্র। তা হোক, আপনারা মাঝে মাঝে কাছে আসবেন আমার কাছ থেকে কাজের ভার নেবার জন্যে নয়, আমারই কাজকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে— চতুর্দিকে আপনাদের হৃদয় অনুভব করে আমি "আমরা" হয়ে উঠতে পারি। আপনাদের বল আমাকে দিন— আমার বল আছে ব'লেই যে তার আকর্ষণে যোগ দেবেন তা নয়, কিন্তু আপনাদের বল আছে বলেই আমাকে দান করবেন। আপনাদের সঙ্গে আমার যে মিলন হয়েছে তা ঈশ্বর একদিন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সার্থক করে দেবেন। ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৫

—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। স্মৃতি, পৃ ১০-১২

…আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লীগঠনকার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করছে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়— ও-সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সব চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই-সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট।… এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করছেন, কাজেই আমার মতো জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নামতে হয়েছে। আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্ছি নে— কিন্তু সেইজন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা যখন ফিরে আসবেন— আশা করছি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে। [এপ্রিল ১৯০৮]

—অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত। চিঠিপত্র ৬

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রপ্রতিম সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কী অভিপ্রায় জাগ্রত ছিল নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি-

পত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়; পল্লীর উন্নতিবিধানে সমবায়-নীতির প্রসঙ্গও এই চিঠিগুলিতে আলোচিত—

কলিকাতা

… এ বৎসরে তো ভারতবর্ষে একটা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে এসেছে। শরতে যে বৃষ্টি নিতান্ত দরকার সেটা একেবারেই হল না— সেই-জন্যে আমন ধান জ্বলে যাচ্ছে এবং রবিশস্যের চাষের ব্যাঘাত ঘটেছে। বাংলাদেশের অবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মতো তত বেশি নৈরাশ্যজনক নয়— কিন্তু তবু এখানেও আমাদের খুব ক্ষতি হয়েছে। উপরি উপরি কয়েক বছর শস্য না পাওয়াতে প্রজারা নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে। গেল বছরে প্রজাদের অনেক টাকা ঘর থেকে দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছে, এবারেও তাই করতে হবে— এতে বাংলার জমিদারদের দুঃসময় উপস্থিত হবে। তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ— ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তা হলে এই ক্ষতি পূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষির টাকা এবং এই চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে। এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল— নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে। আজ-কাল যে-সমস্ত বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নেই, কিন্তু অনাহার থেকে দেশের লোককে যথাসম্ভব বাঁচানোই তোমাদের জীবনের ব্রত হবে— এতে তোমাদের নিজেদের যদি ক্ষতি হয় তাও স্বীকার করতে হবে।… ইতি ১২ই কার্তিক ১৩১৪

শিলাইদহ

…গ্রাম-পল্লীকে organise করে তোলবার যে প্রস্তাব আমার বক্তৃতায়

করেছি সেটা আমি কাজে খাটাবার জন্যে পূর্ব হতেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার জমিদারির মধ্যে এই কাজের জন্যেই আমি ভূপেশকে লাগিয়ে দিয়েছি। আপাতত সে একটা পাড়াকে গড়ে তোলবার বিশেষ ভার নিয়েছে— দেখা যাক তোমাদের এই বরিশালের যুবকটির দ্বারা কতটা কাজ হয়। আরও দুটি ছেলেকে এই কাজে ভূপেশের সহকারীরূপে লাগাব বলে স্থির করেছি— তারা আর সপ্তাহখানেক পরে এসেই কাজে যোগ দেবে। যাকে cottage industries বলে, অর্থাৎ ছোটোখাটো অনতিব্যয়সাধ্য কল নিয়ে গ্রামের লোক যে-সমস্ত কাজ করতে পারে, এখানকার পল্লীগ্রামে সেই-সমস্ত চালানো উচিত বলে আমি স্থির করেছি।

আমেরিকায় ভারতহিতৈষী যে-একটি সভা হয়েছে এ সম্বন্ধে তারা কি আমাদের কোনো পরামর্শ বা সাহায্য করতে পারেন? আমি যদি পারি তবে বোলপুর বিদ্যালয়ে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলে বিশেষভাবে এই-সকল cottage industries'এর উপযোগী শিক্ষার আয়োজন করতে ইচ্ছা করি। বৌদ্ধভিক্ষু ধর্মপাল আমাকে কতকগুলি আমেরিকান যন্ত্র দেবেন বলেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা এই যে, বোলপুরের ঐ টেক্‌নিকাল বিভাগের নাম Indo-American Industrial Institution রাখা হয়, তা হলে তিনি আমেরিকা থেকে সাহায্য জোগাড় করে দিতে পারবেন। সে কতদূর হবে জানি নে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খবর নেওয়া দরকার। তোমরা ঐ সভার কোনো সভ্যকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখে যদি সংবাদ নিতে পার তবে চেষ্টা কোরো।

আমি তো ইচ্ছা করছি শিলাইদহে চৈত্র মাসটা কাটিয়ে নূতন বৎসরে এখান থেকে যাব। তা যদি ঘটে ওঠে তবে তার মধ্যে এখানকার পল্লীর কাজটাকেও কতকটা পরিমাণে অগ্রসর করে দিয়ে যেতে পারব।...ইতি

৫ই ফাল্গুন ১৩১৪

বোলপুর

…তুমি কোনো চাকরির বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করতে চাও না এবং সামান্য কিছু জমি নিয়ে দেশের সাধারণ কৃষিজীবীদের সুখেদুঃখে যোগ দিতে ইচ্ছা কর এ কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। দেশের মঙ্গল-সাধনই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক, ধনসম্পদের মোহ তোমাদের মনে লেশমাত্র না থাক্, এই আমি আশীর্বাদ করি। সত্যভাবে গরিব হতে পারার মতো সম্পদ্ জগতে আর কিছুই নেই। সেই পবিত্র সম্পদে তোমরা ভূষিত হয়ে জীবনকে ধন্য কর।… ইতি ৩১ চৈত্র ১৩১৫

‥ রথীর কাজেরও আয়োজন চলছে। যে ক্ষেত্রটি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা করলে অনেক উপকার করতে পারবে। দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের দেশের কাজ। এই কাজে তুমিও যদি ওর সঙ্গে যোগ দিতে পার তা হলেই রথী কৃতকার্য হতে পারবে— এইজন্যে ও তোমাকে চাচ্ছে।

রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তা হলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাদের সঙ্গে co-operationএ চাষ করা, ব্যাঙ্ক্ করা, ওদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণমোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই। এক জায়গায় যদি আমরা এইরকম আদর্শ পল্লী-স্থাপনে কৃতকার্য হতে পারি তবে সমস্ত দেশের পক্ষে তার চেয়ে লাভের আর কিছুই হতে পারে না। এই-সমস্ত মঙ্গলকর্মে জীবন উৎসর্গ করতে কাউকেই দেখতে পাই নে— কেবলই উত্তেজনা, উন্মাদনা, উৎপাত। যেখানে যথার্থ ত্যাগ, যথার্থ কাজ, সেখানে কারও উৎসাহ দেখি নে। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে হীনশ্রেণীর উন্নতির জন্যে পড়ে থাকায় কেউ সুখ

পায় না— তার কারণ, দেশকে সত্যভাবে কেউ ভালোবাসে না— কেউ সেবা করতে চায় না, প্রভুত্ব করতেই চায়।

মঙ্গলের ভিতর দিয়ে দেশকে সৃষ্টি করে তোলার কাজে যদি তোমরা লাগ তা হলে বড়ো খুশি হব— এই হচ্ছে ধর্মের কাজ, এই হচ্ছে পুণ্যকর্ম, এই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা। মনকে সমস্ত অনাবশ্যক বিরোধ বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে, বিদেশী ইতিহাসের সমস্ত তামসিক অন্ধ সংস্কার থেকে চিত্তকে নির্মল ক'রে তুলে, স্নিগ্ধভাবে শান্তভাবে সাত্ত্বিকভাবে একেবারে মূলের থেকে দেশের কাজে আমরা প্রবৃত্ত হব— অসাধ্যসাধন আমাদের ব্রত, আমরা পূর্ব-পশ্চিমকে শত্রু-মিত্রকে মহৎ প্রেমে পরম মঙ্গলে এক করব এই আমাদের 'লক্ষ্য' থাক্‌। ইতি ২০শে মাঘ ১৩১৩ [১৩১৬]

... সন্তোষ পাঁচটি গোরু নিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়েই একটি ছোটো-খাটো dairy খুলেছে।

বোলপুরে গোরু রাখার বিস্তর অসুবিধা— ঘাস নেই, গোরুর অন্যান্য খাবারও বহুদূর থেকে বেশি দাম দিয়ে আনিয়ে নিতে হয়। তবু দেখা যাচ্ছে লোকসান হবার আশঙ্কা বেশি নয়। আরও যদি গোটা-দশেক গোরু আনা যায় তা হলে ঐ জায়গাতেই ১৫০।২০০ টাকা মাসে খরচ বাদে পাওয়া যেতে পারে। সন্তোষকে ম্যানেজার রেখে ব্যাবসা খোলবার জন্যে দু-তিন জায়গা থেকে বড়ো বড়ো প্রস্তাব এসেছে। এটা বেশ দেখা যাচ্ছে চাষের চেয়ে আপাতত আমাদের দেশে গোরুর ব্যাবসা অনেক বেশি লাভজনক। দেশে গোরুর উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন। নইলে আর কিছুদিন পরে চাষের ভয়ানক দুর্গতি হবার আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশের সকল পাড়াগাঁয়েই দুধ ঘি দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, শুধু কতকগুলো মশলা-গোলা জল দিয়ে ভাত খেয়ে বাঙালি কখনও মানুষ হতে পারবে?

দেশের অবস্থা যতই দেখতে পাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি সর্বসাধারণকে নিয়ে co-operative প্রণালী অবলম্বন না করলে আমরা কোনোমতেই দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে এত বিচ্ছেদ এবং চাষারা ভদ্রলোকদের এতই অবিশ্বাস করে যে, সমবায়-মণ্ডলী গড়ে তোলা আমাদের দেশে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। শুনতে পাই আয়ার্ল্যাণ্ডে এই সমবায়-মণ্ডলীর খুব প্রচলন এবং উন্নতি হয়েছে। সেখান থেকে Co-operative Dairy প্রভৃতি কাজের প্রণালী যদি তুমি কিছুদিন দেখে-শুনে আসতে পার তা হলে এ দেশে সেটা কাজে খাটাতে পার। আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা নানা কারণে অনেকটা আমাদের দেশের মতো, তারা রক্ষা পাবার জন্যে কিরকম চেষ্টা করছে তা দেখে এসে বোধ হয় সে অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগবে।

আমার বিশ্বাস কুষ্টিয়ায় আমাদের প্রজাদের নিয়ে Co-operative Dairy খোলার ভালো ক্ষেত্র আছে— এই-সকল কাজ সম্বন্ধেই তোমার আসার প্রতীক্ষা করছি। আমি দেখছি তোমার উপরেই রথীর সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে এবং সেইজন্যেই সে তোমার শীঘ্র ফিরে আসার দিকে তাকিয়ে আছে— এ-সব কাজ ঠিক একলা চলে না। তোমার উপর রথীর এই বিশ্বাস ও নির্ভর দেখে আমার মন খুব আনন্দিত হয়েছে। তোমরা দুজনে একত্র হয়ে পরস্পরের সহায় হয়ে কাজ করবে এর চেয়ে সুখের বিষয় আমার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।··· ইতি ৩০শে ফাল্গুন ১৩১৩ [১৩১৬]

··· তোমাদের 'কর্মী' পড়ে দেখলুম। বেশ ভালোই হয়েছে। এই কাগজে তোমরা AEর *National Being* -এর মর্মটা যদি পাঠকদের দাও তো ভালো হবে। আমাদের একটা কথা বুঝতে হবে, কালের সঙ্গে যারা

সামঞ্জস্য না ক'রে উজান ঠেলে সাবেক যুগে ফিরে যেতে চায় তারা কালের দ্বারা নিহত হয়। বর্তমান কালের মধ্যে যে ব্যাধি আছে বর্তমানের ক্ষেত্রেই তার ঔষধ বেরোবে। কল যেখানে দৌরাত্ম্য করে বিজ্ঞানের সাহায্যেই সেই দৌরাত্ম্যের প্রতিরোধ সম্ভব। বৈজ্ঞানিক কলের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী লড়তে পারবে না। AEর বইয়ে যে ঔষধ ও পথ্যের আলোচনা আছে তাতে কোনো অন্ধ সংস্কারকে সহায় মানা হয় নি— তাতে বর্তমানের সঙ্গেই বর্তমানের আপোষের কথা আছে। এক সময় যেখানে জল ছিল না সেখানে গোরুর গাড়ি চলত— এখন সেখানে নদী বইছে। নূতন অবস্থার উপযোগী যানবাহন চাই; রাগ করে গোরুর গাড়ি চালানো কালস্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া। গোরুর গাড়ির অনেক সুবিধা সন্দেহ নেই, সস্তাও বটে, কিন্তু বর্তমানকালে যদি তার পথ না থাকে তা হলে নৌকোর কথা ভাবতেই হবে— সে নৌকো ড্রেড নট্ না হতে পারে কিন্তু নৌকো হওয়া চাই। AE সেই জলপথের জন্যে নৌকোর কথা আলোচনা করেছেন, সস্তা বলে গোরুর গাড়ির কথা তোলেন নি। ইতি ৯ আশ্বিন ১৩২৮

—দেশ

রথীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র সকলেই শিক্ষালাভান্তে দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত কর্মে অল্পবিস্তর আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রথীন্দ্রনাথ 'পল্লীর উন্নতি: পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পল্লীমঙ্গলচেষ্টার যে বিবরণ লিখিয়াছেন এখানে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

যৌবনের প্রারম্ভেই আমার পিতা মহর্ষিদেবের কাছ থেকে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ একটি কার্যভার পেলেন। মহর্ষি আদেশ করলেন তাঁকে জমিদারি চালনা করতে হবে। সে সময় জমিদারি সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল; সেগুলি অনেক জায়গায় ছড়ানো— বাংলায় ছিল তিনটি পরগনা তিন

বিভিন্ন জেলায়; পাবনায় শাহাজাদপুর, রাজশাহীতে কালিগ্রাম ও নদীয়াতে বিরাহিমপুর। এ ছাড়া উড়িষ্যায় ছিল আরও তিনটি ছোট ছোট জমিদারি।

এই কাজের ভার পেয়ে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হল। তিনি চলে গেলেন শিলাইদহে। শিলাইদহে ছিল বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি। কাজের সুবিধার জন্য বাবা শিলাইদহে তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্র করলেন। সেখান থেকে শাহাজাদপুর ও কালিগ্রামে নদীপথে সহজেই যাওয়া যায়।

শিলাইদহ পদ্মানদীর ধারে, সেখানে থাকত 'পদ্মা' বোট। বাবা এই বোটে করে কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি, শাহাজাদপুর, পতিসর ও অন্যান্য যে সব জায়গায় আমাদের কাছারি ছিল যাতায়াত করতেন।

বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই, জলপথে প্রায় সব স্থানেই যাওয়া যায়। বোটে করে খাল বিল নদী বেয়ে ঘুরতে বাবা ভালোবাসতেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের তাঁর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল দেশকে ভালো করে জানা, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া। জমিদারি দেখার কাজ তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পীড়াজনক হয়ে উঠত যদি-না এই সূত্রে গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ তাঁর হত।

গ্রামের ও গ্রামবাসীদের অবস্থা বাবাকে কতখানি বিচলিত করেছিল, সেইসময়কার তাঁর লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্যা যে সমগ্র দেশের সমস্যা, দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামের উন্নতির উপর, দেশসেবা মানেই যে লোকসেবা, এই সব কথা বারবার নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, গ্রামের দুরবস্থা জানিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেষ্ট হবার জন্য বারবার তাদের মনকে নাড়া দেবার প্রভূত প্রয়াস করেছেন।

··· গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে জেনে এবং সকলকে কেবল জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে অবধি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে তিনি নিজে কি করতে পারেন সে বিষয় অহরহ চিন্তা করেছেন, এক-একটি সমস্যা নিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন।

আমার পিতা গ্রামের উন্নতির জন্য কতখানি ভাবছেন, কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি ও মানসিক জড়তা দূরীকরণের জন্য কি কি উপায় স্থির করেছেন আমি প্রথম জানলুম ১৯১০ সালে। আমি তখন আমেরিকা থেকে ইউরোপ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কি উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালীর মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।

'স্বদেশী সমাজ' 'সভাপতির অভিভাষণ— পাবনা সম্মিলনী' প্রভৃতি নানা বক্তৃতায় তিনি সর্বসাধারণকে, বিশেষতঃ কংগ্রেসের নেতাদের, দেশসেবার কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য অনুনয় করেন। তিনি বলেন—

'দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব ? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।'

অন্যত্র লিখেছেন—

'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এইখানেই প্রাণের নিকেতন ; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।'

ভিত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমত তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে। যখন দেখলেন দেশবাসী তাঁর কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং তিনি দেশসেবার যে কর্মপদ্ধতি তাদের সামনে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাই হতে থাকল, নেতারা কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনাতেই মেতে রইলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমত তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিনজনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব-আগে ফিরে এলুম। আসবামাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য।

শিলাইদহে কিছুদিন থেকে সেখানকার কাজকর্ম বোঝানো হয়ে গেলে বোটে করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন পতিসরে। যাবার পথে রোজ সন্ধেবেলায় বোটের ডেকের উপর বসে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত ··· বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কি শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখেছেন, তাদের জীবন-যাপনের কত রকমের

সমস্যা লক্ষ্য করেছেন, এই সব সমস্যার প্রতিকারের তিনি কি চেষ্টা করেছেন ও ভবিষ্যতে আরও কি করতে ইচ্ছা করেন।...

বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারের প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম এই দুই পরগনায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না। এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপীলের সুযোগ দেবারও ব্যবস্থা করা হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপীল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হত। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপীল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হত না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে— আদালতে যাবে না। বিচারের নথিপত্র রীতিমত রাখা হত, সেগুলি সযত্নে ফাইল করে রাখার সাহায্য করত জমিদারির সেরেস্তা।

আদালতের সাহায্য বিনা, বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা এত অনায়াসে চলেছিল। ছোট বড় কোনোরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল।

দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গবর্নমেণ্ট কখনো আপত্তি তোলে নি বরং উৎসাহ দিয়েছে।

··· বোটে যেতে যেতে বাবা আমাকে বোঝাতে লাগলেন— তিনি এতদিন পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় যেটুকু সম্ভব তাই করছেন, কিন্তু গ্রাম-সংস্কারের কাজ জমিদারির কর্মচারীদের দ্বারা হয় না। সেই জন্য তিনি ঠিক করেছেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকজন শিক্ষককে শিলাইদহ ও পতিসরে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের উপরেই বিশেষভাবে এই কাজের ভার থাকবে।

শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্‌ভাব নেই। কুষ্টিয়া কুমারখালি প্রভৃতি শহরের সান্নিধ্যে প্রজাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, তারা স্বাভাবিক সরল মনোভাব হারিয়েছে, নতুন কিছু প্রবর্তন করতে গেলেই সন্দেহ করে। কয়েক বছর চেষ্টা করেও সেখানে বিশেষ কিছু করতে পারা যায় নি। একমাত্র কুষ্টিয়াতে তাঁতের বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছিল।

এই কারণে কালিগ্রাম পরগনাতেই তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। সেখানকার প্রজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা আছে। কাজের সুবিধার জন্য এই পরগনাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরগনার সমস্ত প্রজারা মিলে একটি সমিতি নির্বাচন করেছে— তার নাম হয়েছে 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। তা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের প্রজারা একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'ও নির্বাচন করেছে। শান্তিনিকেতন থেকে যে কর্মীরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাজের কেন্দ্র হবে এক-একটি বিভাগে।

প্রজারা হিতৈষী সভার কাজ চালাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেরা চাঁদা দিচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জন্য তাদের কোনো পৃথক ব্যবস্থা করতে হয় নি,

তার জন্য ব্যয়ও কিছু হয় না। খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়। হিতৈষী সভার সমস্ত কিছু কাজ বিভাগ থেকে করা হয় বলে আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে সেখানে বেতনভোগী একজন করে কর্মচারী রাখা হয়েছে।

কালিগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়— প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে। হিতৈষী সভার সভ্যের সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়।

সাধারণতঃ বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমতঃ গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কি কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভার এই দুটি হল প্রধান কাজ— আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি-পরিচালনায় কর্মচারীদের কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।

টাকায় তিন পয়সা চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল। প্রজাদের উৎসাহ দেবার জন্য বাবা বললেন, এস্টেট

থেকে তিনি আরো দু হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিতৈষী সভার জন্য যে টাকা উঠত প্রজারা তাকে 'সাধারণ ফণ্ড' বলত। আমার যতটা মনে পড়ে চাঁদার হার পরে বাড়ানো হয়েছিল ইস্কুল ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতির সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা দরকার, হিতৈষী সভা আপাততঃ কেবল কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পেরেছে, তার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হল প্রধান। সারা পরগনার মধ্যে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই পূর্বে ছিল না। অবস্থাপন্ন লোক তাদের ছেলেদের নাটোর আত্রাই বগুড়া প্রভৃতি শহরে পাঠাত ইস্কুলে পড়াবার জন্য। হিতৈষী সভা দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরাজি ও পতিসরে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেছে। ইস্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাসের ঘর নির্মাণ করার মত টাকা সাধারণ ফণ্ড থেকে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাবা এস্টেটের খরচে সেগুলি তৈরি করে দিয়েছেন।

শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন ছিল। ঐ অঞ্চলে কোথাও একটিও পাস-করা ডাক্তার ছিল না। প্রথমে পতিসরে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়— তার পর ক্রমশঃ অন্য দুটি বিভাগেও ডাক্তারসহ ডিস্‌পেনসারি স্থাপিত হল। কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য এস্টেট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়। পতিসরের চিকিৎসালয় বেশ ভালো হয়েছে এবং এখানে বহুসংখ্যক রোগী দৈনিক চিকিৎসার জন্য আসে।

কালিগ্রাম পরগনা চলন বিলের সংলগ্ন। বর্ষাকালে শস্যক্ষেত সমস্তই জলমগ্ন হয়ে যায়, গ্রামগুলি উঁচু জমির উপর, দেখতে এক-একটি দ্বীপের মত। বাবা বললেন, তুই তো দেখেছিস রাস্তা কোথাও নেই— গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে গেলে ধানক্ষেতের আল ধরে হেঁটে যাতায়াত

করতে হয়, বর্ষার দিনে নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে সর্বত্র যাওয়া-আসা চলে। সাধারণ ফণ্ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা এস্টেট থেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রাস্তা প্রস্তুত করতে বহু টাকা খরচ— সাধারণ ফণ্ড থেকে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

এই কয়েকটি প্রধান কাজ ছাড়াও, বুজে যাওয়া মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষিসভা ক্রমশঃ হাত দিচ্ছে। পতিসরে একটি ধর্মগোলারও ব্যবস্থা হয়েছে।

আমেরিকায় যে তিন-চার বছর কলেজে পড়েছিলাম সেই সময়ে বাবা জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে যে এত রকমের কাজে হাত দিয়েছেন তা কিছুই জানতুম না।...

বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষীরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু-একটা money crops করা যায় কিনা তার পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষীদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখান হল। শিলাইদহের দোআঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোটখাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটারি গড়ে তুললুম।

চাষীদের মধ্যে ক্রমশঃ উৎসাহও দেখা গেল, আলু আখ টমাটো প্রভৃতির চাষ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সারের অভাব কি করে ঘোচানো যায় ভাবছি এমন সময় আকস্মিক ভাবে একটি উপায় আবিষ্কার করলুম। শিলাইদহের ধারে পদ্মানদী থেকে বিস্তর ইলিশ মাছ কলকাতায় রপ্তানি হয়। বেড়াজালে এক-এক সময় এত মাছ ওঠে যে অত মাছ শিকারীরা নিতে চায় না। একদিন দেখলুম ডিম বের করে নিয়ে নুন দিয়ে রাখছে আর মাছগুলি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকা বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। এক বছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।

শিলাইদহ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পেলুম। কিন্তু পতিসরে সে সুযোগ নেই, দেশটা নিতান্তই একফসলে; বর্ষার কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে আর জল নেমে গেলে মাটি শুকিয়ে এত কঠিন হয়ে যায় যে লাঙল চলে না। সেইজন্য রবিশস্য কিছুই হয় না; এমন কি গাছপালাও জন্মায় না। বাবা কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও কালিগ্রামের আবাদের কি উন্নতি হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তা করতে ছাড়েন নি।[৭] ১৩১৫ সালে [১৭ শ্রাবণ তারিখে] তিনি কোনো কর্মীকে [শ্রীভূপেশচন্দ্র রায়কে] লিখছেন—

'প্রজাদের বাস্তবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে

বিশেষ লাভের হইবে। অবশ্য তাহাতে জলসেচন আবশ্যক করে। এইজন্য প্রত্যেকে যদি নিজের ভিটায় দুই এক কাঠাও বপন করে তবে তাহার জলসেচন নিতান্ত অসাধ্য হয় না। কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।'

অনেক চেষ্টার ফলেও কালিগ্রামে চাষবাসের বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হয় নি।... কৌতূহল মেটাবার জন্য ট্র্যাক্টর নিয়ে আমি নেমে গেলুম ধানক্ষেতে। কয়েকজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করলুম, আলের উপর দিয়ে লাঙল না চালিয়ে তো উপায় নেই— আল বাঁচিয়ে ছোট ছোট ক্ষেত মেশিন দিয়ে চাষ দেওয়া সম্ভব নয়। তারা আমাকে আশ্বাস দিল, 'ভাবনা নেই ; আপনি আলের উপর দিয়ে চাষ দিয়ে যান, আমরা কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, সঙ্গে সঙ্গে আল আবার বানিয়ে নেব।' প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই কৃষকেরা খুব খুশি। ট্র্যাক্টর পতিসরেই থাকবে স্থির হল। আমি জানালুম, চাষ করে দেবার জন্যে বিঘাপ্রতি এক টাকা মাত্র খরচা হিসাবে নিয়ে ভাড়া দেওয়া হবে। তার পর থেকে ট্র্যাক্টরের চাষ সর্বত্র চলতে লাগল, এবং সেটা ভাড়া নেবার জন্য চাষীদের মধ্যে রেষারেষি পড়ে গেল। পতিসর থেকে চলে আসার আগে প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হল— আগামী বছরে আরও ট্র্যাক্টর আনিয়ে দেব।

বছরের বেশ কয়েক মাস চাষীদের কোনো কাজ থাকে না। এই সময় হাতের কাজ করে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে। বাবা আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন কয়েকটি কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করতে। কালিগ্রামে ভালো তাঁতি ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে কয়েকঘর জোলা ছিল তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতে কাপড় বোনা শেখবার

জন্য। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল সাধারণ ফণ্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়নশিক্ষার ইস্কুল খোলা হল। এই সময়ে (১৯১১-১২) বাবা আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

'বোলপুরে একটা ধানভানা কল চল্‌চে— সেইরকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ — বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫।১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারে। আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে ধার দিয়ে এই ধান ভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে— নগেন্দ্র এবং জানকী দুজনেরই বিশ্বাস এই কাজটা এখানকার যোগ্য এবং এতে প্রজাদের উপকার হবে। এই কলের সন্ধান দেখিস।

'তার পরে এখানকার চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না— এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস— অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিষ ব্যবহার করে এরা যদি সেইরকম মোটা গোছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তা হলে উপকার হয়। আর একটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন

কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায়, পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।

'যাই হোক্ ধানভানা কল, Potteryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস— ভুলিস নে।'[৮]

বাবার আমলেই কালিগ্রাম পরগনায় কয়েকটি ইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাবাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় নি। প্রজাদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। তারা যে-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা পাবার যথেষ্ট সুযোগ পায় তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। পাঠশালা ইস্কুল তাড়াতাড়ি খোলবার জন্য রেষারেষি পড়ে যেত। প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে সাধারণ ফণ্ডের সমস্ত টাকাই বোধ হয় তারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করে ফেলত। বাবাকে এই বিষয়ে প্রজাদের উৎসাহ অনেক সময় সংযত করতে হত। পাঠশালা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, কয়েক বছরের মধ্যে পরগনার প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাঠশালা স্থাপিত হল। এই সঙ্গে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিসরে একটি হাই স্কুল খোলা হল। বর্ষাকালে চারদিক জলে ডুবে যায়, পতিসরে গেলে দেখতুম নৌকা বোঝাই করে ছাত্ররা আশেপাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলে পড়তে আসছে। কলকাতার ইস্কুল-কলেজের যেমন নিজেদের বাস্ রাখতে হয়, কালিগ্রামের ইস্কুলগুলির তেমনি কয়েকখানা করে নৌকা থাকত।

গ্রামের অভাব দূর করার জন্য হিতৈষী সভা নানান দিকে চেষ্টা করেছে— শিক্ষাবিস্তার, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্প প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবসা, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, সালিশের বিচার, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি— কিন্তু একটি অভাব দূর করতে পারে নি, দূর করার ক্ষমতা ছিল না বলে।

জমিদারির সঙ্গে পরিচয় হবার পরই বাবা লক্ষ্য করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সকলেরই ঋণ আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রামবাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, দেনা থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এইটাই ছিল পল্লীসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনো উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পান নি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়— কিন্তু সুদের হার এত বেশি আর সুদের সুদ আদায় হত বলে আসল কোনোদিন শোধ হত না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজনমত কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখনিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধব ও দুএকজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার-করা টাকা— ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮৲ সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২৲ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য, তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিক ভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১,০৮,০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের

হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কি করবেন। সুরেনদাদা [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দুদিকেই উপকার হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষি-ব্যাঙ্ক ছিল বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমন-কি কয়েকজন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtedness এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না— নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারে নি।

··· সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাই স্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম —নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মোকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পস্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে

আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা খাঁচা ব্যবহার হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানারকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গভর্ণমেণ্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষীরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবুমশায়, আমাদের আরও ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?'

১৩১৫ সালে বাবা যে লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—

'যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথ-ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়— তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।'

তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।

—রবীন্দ্রায়ণ ২

১৯১৫-১৬ সালে পল্লীর উন্নতিচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী শ্রীঅতুল সেনের প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে লিখিত এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত একটি বিবরণ[১] এখানে উদ্‌ধৃত হইল—

কালিগ্রাম পরগনা ঠাকুরবাবুদের জামিদারির অন্তর্ভুক্ত— রাজশাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রানীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদীঘি, নসরৎপুর ও তালোরা— এই কয়টি রেল স্টেশনকে ঘিরিয়া এই পরগনা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেক শত মাইল ব্যাপিয়া। অতুল সেন হইলেন প্রধান কর্মী, শ্রীযুপ্ত উপেন্দ্র ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছিলেন

তাঁহার সহকারী। সঙ্গে অতুলবাবুর কর্মীসংঘ। কবিনির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ পাঁচটি : ১ যথাযোগ্য চিকিৎসাবিধান, ২ প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, ৩ পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্‌ অর্থাৎ কূপখনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, ৪ ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা, ও ৫ সালিশীবিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

প্রথমে কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে ; পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে, হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি বেডেরও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সৎকার্যের ব্যয়ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও অংশত প্রজারা বহন করিতেন ; খাজনার টাকা পিছু এক আনা তিনি দিতেন, প্রজারা দিতেন এক আনা। আর এক উপায়েও অর্থ সংগ্রহ হইত। আমাদের দেশের রীতি এই যে (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে) কোনও ব্যক্তি সামাজিক কোনও অপরাধ করিলে তাহাকে সামাজিকভাবে বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হয়। সেই অর্থে একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় সাধারণ ফণ্ডে সামান্য কিছু চাঁদা দিয়াই এই বিরাট ব্যয়ের হাত হইতে অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাইত। সাধারণ ফণ্ডের টাকা এই সকল সৎকার্যে ব্যয়িত হইত।

দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির এবং দিনের (day and night) উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয় ; শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া শেখা ও পাটীগণিত (Reading, Writing and Arithmetic) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। এই শিক্ষা কিছু

অগ্রসর হইলেই বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া চলিত। প্রধান লক্ষ্য থাকিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিক-ভাবে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোলও তাহাদিগকে শিখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (first aid), কৃষিকর্মের সুবন্দোবস্ত, অগ্নিনির্বাপণ, বন্যার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসর সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোর ব্যবস্থা ছিল।

তৃতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্‌ সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের সজাগ করিয়া কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কার্যে ব্যয় অত্যন্ত অধিক। পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত, জঙ্গল সাফ— প্রত্যেকটিই ব্যয়সাধ্য কাজ। চাঁদা তুলিয়া যে এই কার্য করা যাইবে, চাষীদের অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন নহে। সুতরাং অতুলবাবু একটি সুচিন্তিত স্কীমের আশ্রয় লইলেন। স্কীমটি কবির সানন্দ সমর্থন লাভ করিল। প্রজাদের নিকট হইতে কায়িক পরিশ্রমরূপ চাঁদা লওয়া হইতে লাগিল, অর্থাৎ এই সকল কাজে তাহারা 'জন' খাটিতে লাগিল। যাহাদের সেইরূপ সামর্থ্য ছিল না অথচ সংগতি ছিল, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন 'জনে'র মজুরি দিতে লাগিল। এইরূপে মাত্র সাত আট মাসের মধ্যেই কালিগ্রাম পরগনায় বহু সহস্র টাকার কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। বাংলাদেশের কোথায়ও ইতিপূর্বে প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় আর এইরূপ হয় নাই।

চতুর্থ উদ্দেশ্য— ঋণদায় হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা ; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার স্কীমটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাংলাদেশে একটা জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ অতিশয় অত্যাচারী জবরদস্ত জমিদার ছিলেন, ঋণের দায়ে প্রজার ফসল পর্যন্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন।

ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জ মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। এই মিথ্যা রটিবার একটা হেতু ছিল। তাহাই বলিতেছি। প্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর পর্যন্ত তাহাদের চলে না; কারণ মাঝ-খানে কাবুলী অথবা কাবুলীপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মহাজন বসিয়া থাকে। শুধু সুদের দায়ে ফসল যায়, ঋণ যেমনকার তেমনই রহিয়া যায়। চাষী প্রজা বৎসরের কয়েক মাসই প্রায় অনশনে কাটায়, ইহার প্রতিকারার্থ রবীন্দ্রনাথ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। স্টেট হইতে প্রজাদিগকে ঠিক প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রয়োজন মাফিক এইজন্য যে, অনেক সময় তাহারা বুঝিতে না পারিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ লইয়া বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বে উল্লিখিত সামাজিক দণ্ডের ব্যাপারে প্রজারা অনেক সময় ধোপা নাপিত বন্ধ হইবার ভয়ে বেহিসাবীরূপ ভোজনদক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হইয়া বিপন্ন হইত। অতুল সেনের কর্মীসংঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নির্ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং ভোজনদক্ষিণার পরিবর্তে সাধারণ ফণ্ডে কিছু চাঁদা লইয়াই তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে লাগিলেন। বেতন-ভোগী নায়েবদের হাতে ছাড়িয়া দিলে অনাচার হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঋণ লইয়া চাষী চাষ করিল। ফসল কিন্তু তাহার ঘরে উঠিল না, ঋণ শোধ বাবদ স্টেট তাহা গ্রহণ করিল; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা সুদ সর্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত অর্থাৎ প্রজাকে শতকরা ছয় টাকা সুদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া ঋণ শোধ করিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মাফ করা হইত। ইহার পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজন মত ঋণ লইবার অধিকারী থাকিত। ইহাতে চক্রবৃদ্ধি হারে সর্বনাশা সুদের কবল হইতে তাহারা সর্বদাই রক্ষা পাইত। এই

স্কীম এতদূর পর্যন্ত সফল হইয়াছিল যে কালিগ্রাম পরগনায় অন্যান্য মহাজনদের, বিশেষ করিয়া কাবুলীপন্থী মহাজনদের ব্যবসায় অচল হইয়াছিল। স্টেটের এমনই সুনাম হইয়াছিল যে, কোনও প্রজা অন্য কোনও মহাজনের নিকট টাকা ধার করিতে গেলেই মহাজন বলিত, বাপ রে, স্টেট হইতে যে ঋণ পায় নাই, তাহাকে ঋণ দিব কোন্ সাহসে? অর্থাৎ স্টেট যাহাকে ঋণ না দেয়, তাহার নিশ্চয়ই কোনও গলদ আছে। এই ব্যবস্থার ফলে কালিগ্রাম পরগনার প্রজারা বহুদিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে অপবাদ রটিয়াছিল, তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফসল উঠানো লইয়া।

পঞ্চম উদ্দেশ্য— সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। এইরূপ সালিশীর ব্যবস্থা ঠাকুর স্টেটে অল্প বিস্তর পূর্ব হইতেই ছিল। এবারে এই কার্যের ভার অতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হইত। তিনি বিচার-বুদ্ধি-মত সুরাহা করিয়া দিতেন। এই কার্যে প্রজারা এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সম্ভবত মামলার অপব্যয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল বলিয়াই, যে, তাহারা অতুলবাবুকে হিন্দু মুসলমান ভেদে যথাক্রমে অতুলবাবু মশাই— রাজাবাবুর প্রতিনিধি এবং মৌলানা রতুলবাবু বলিত। রবীন্দ্রনাথই রাজাবাবু ছিলেন, এই স্কীম যতদিন চলিয়াছিল ততদিন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর এই পরগনা হইতে একটি মামলাও সদরে যাইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

শ্রীঅতুল সেনকে এই সময়ে লিখিত প্রাসঙ্গিক কয়েকখানি চিঠিও পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল—

[পদ্মাচর। অগ্রহায়ণ ১৩২২]

কালিগ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল— এমন কি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে আমি ঐ কথা আলোচনা করে ঘুমতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা সুস্থ হল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে এখানে এসেছি তাই কয়েক দিন নদীর উপরে থেকে একটু সুস্থ হয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। এখানেও প্রজাদের নানা দরবার উপস্থিত হয়েছে তাই সমস্ত না সেরে নড়তে পারছি নে? কাজকর্মের প্রণালী সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বসে মোকাবিলায় ঠিক করা যাবে।

[কলিকাতা]

তোমার অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলাম।

তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থাৎ যাহাতে কাজের অঙ্গ কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিবে। তোমাদের হিসাব যখন audit হইবে তখন সকল প্রকার ব্যয়ের voucher যেন থাকে এবং মোটা মোটা খরচ সম্বন্ধে সুরেনের হুকুম আদায় করিয়া রাখিয়ো— হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৬ই মাঘ ১৩২২

[কলিকাতা]

আজ মাঘোৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমার কর্মের মধ্যে তাঁহার শান্তি, কল্যাণ ও প্রেমকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলুন। আমি কয়েকটি ওলাওঠার ওষুধের বাক্স শীঘ্র পাঠাইতেছি। এবং যদি হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে পারি চেষ্টা দেখিব। ইতি ১১ই মাঘ ১৩২২

আত্রাই

তুমি এন্‌ট্রেন্‌স্‌ স্কুলের হেডমাস্টার রূপে মাসিক আশি টাকা বেতন পাইবে স্থির হইয়াছিল এইজন্য বেতন সম্বন্ধে প্রজাদিগকে কোনো কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। এন্‌ট্রেন্‌স্‌ স্কুল উঠিয়া যাওয়াতেই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইল। সাধারণ ফণ্ড হইতে পঞ্চাশ ও স্টেট হইতে ত্রিশ টাকা বেতন স্থির করিলাম। কারণ, সাধারণ ফণ্ডে মাসিক আশি টাকার ভার কিছুতেই সহিবে না। এ কথা লইয়া প্রজাদের মধ্যে কিছু আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু অন্য উপায় নাই। যদি বিদ্যালয়ের কোনো একটা ভার গ্রহণ করিয়া কতকটা ব্যয়ভার লাঘব করিতে পার তবে মন্দ হয় না। সর্বদা মফস্বলে ঘুরিয়া কাজ দেখিবার কাজে তোমার কোনো একজন ছাত্রকে লাগাইতে পারিলে খরচ কম হইবে। কেবল মাসে এক একবার গিয়া বিভাগীয় সভার অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া আসিলেই চলিতে পারিবে। হিতৈষী সভা ও সাধারণ ফণ্ডের কাজে যাঁহারা প্রবৃত্ত থাকিবেন তাঁহারা অন্য কোনো একটা কাজের উপলক্ষ্য লইয়া এটাকে অতিরিক্ত কাজের মত চালাইতে থাকিলেই তবে জোর পৌঁছিবে। যিনি এই কাজেই কর্মচারীরূপে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত তাঁহাকে সেই কারণেই দুর্বল হইয়া থাকিতে হইবে। এই জন্যই আমি মনে করি যে, যদি স্কুল প্রভৃতি সংক্রান্ত কোনো একটা কাজে স্বতন্ত্র নিযুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে সাধারণ কার্যে যোগ দিতে পার তবে অধিক ফল পাইবে এবং সগৌরবে ও সবলে কাজ করিতে পারিবে। নতুবা প্রজাদের কাছে কিছু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেই হইবে। সম্পূর্ণ সময় যদিবা না দিতে পার সম্পূর্ণ জোর দেওয়া আরো অনেক বেশি আবশ্যক। সাধারণের কাজ মনিবের কাজ না হওয়া উচিত। তোমার মাসিক বেতনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩২২

শান্তিনিকেতন

সমস্ত হৃদয়মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও, তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে। টাকা সম্বন্ধে তখনি মনে খটকা বাধিবে যখনি মন বিমুখ হইবে। অবশ্যকর্তব্য সাধন করিতে বসিলে সকলের মন পাওয়া যায় না এবং মন যোগাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না, কিন্তু ওখানকার লোকদের স্পষ্ট বুঝিতে পারা দরকার হইবে যে তুমি অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহাদের সেবায় তোমার পরিপূর্ণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দে কাজ করিতেছে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছোট কথা সুদূরে চলিয়া যাইবে। অতএব কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, একদিন তোমার পূর্ণ আসন তুমি অধিকার করিয়া বসিতে পারিবে। কর্তব্য সম্বন্ধে মনকে একান্ত সহজ কর— ক্ষোভকে দমন কর, যথাসম্ভব শান্ত ও নীরব হও— নম্র হইয়া আপনার শক্তিকে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রয়োগ কর, কর্মকে ধর্মসাধনার ও মুক্তিসাধনার অঙ্গ জানিয়া তপস্যাকে বিশুদ্ধ কর এবং মনকে অনন্তের মধ্যে সমাহিত করিবার অভ্যাস কর; আঘাতকে আনন্দে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ কর, অন্তরের পূর্ণতায় প্রতিদিন অচলপ্রতিষ্ঠ হইতে থাক। ইতি ২১ ফাল্গুন ১৩২২

তোমাদের কাজ যেরূপ চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। সাধারণের হিতের জন্য প্রত্যেককে নিজের সামর্থ্যে খাটাইবার অভ্যাসটি যদি কোনোমতে পাকা হইয়া যায় তাহা হইলেই তোমার সকল চেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার কোথাও ইহার শুরু হইলেই ইহা দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।

আমার একটি কথা বলিবার আছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি

আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা বড়ই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতানুষ্ঠান-গুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো। বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণের উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের লইয়া বনভোজন ও বৃক্ষরোপণ করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্মকর্মের চেহারা পাইবে। আর একটি কথা মনে রাখা চাই। চাষী গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটীরের আঙিনায় তুই চারিটি বেলফুল গোলাপ ফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্যের চর্চা অত্যাবশ্যক এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

বিচালিভরা যে মাতুরের নমুনা পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে বিচালি আরো ঘন করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া দরকার— নহিলে বসিতে বসিতে মাঝে মাঝে গর্ত হইয়া যাইবে।

ম্যানেজার আমাকে আরো কিছু কাঁথা আলপনা প্রভৃতি পরে পাঠাইবেন আশা দিয়াছিলেন— সে আশা যদিচ কালক্রমে তুর্বল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও মরে নাই সে কথা তাঁহাকে জানাইবে। ওখানে বাখারির চাঙারি চুপড়ি প্রভৃতি বিশেষ কোনো দ্রব্য বা মাটির কোনো পাত্র যদি পাও তবে পাঠাইয়া দিয়ো। কুঁড়েঘরের নমুনা পাঠাইবার কথা ছিল ম্যানেজারবাবুর তাহা মনে নাই কিন্তু আমার মনে আছে।

শিলাইদা

তোমার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হয়েছি। আমি পতিসরে এসে পৌছবার পূর্বে তুমি ওখানকার ক্ষেত্রটি বেশ দখল করে বসবে এইটে

হলেই সুন্দর হয়। কেননা আমি মাঝখানে পড়ে যা কিছু করব সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। আমার মন জোগাবার জন্যে কিম্বা আমার হুকুমে যা হবে সেটা হয়ত একেবারে অন্তরের জিনিস হবে না— এবং তার থেকে ঈর্ষা বিরোধের সৃষ্টি হতেও পারে। আমরা যে পক্ষে থাকি সে পক্ষের প্রতি অন্য সকলে অনেক সময় বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে— তার প্রধান কারণ ক্ষমতানাশের আশঙ্কা। এটা আমি বারম্বার দেখেছি, সেইজন্য কারো আনুকূল্য করতে দ্বিধা হয় পাছে সেটা প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা একবার ওখানকার হৃদয় অধিকার করে দাঁড়ালেই আর কোনো ভয় থাকবে না। সে তোমরা নিশ্চয় পারবে আমি জানি। সেই পারাটা তোমাদের নিজের কৃতিত্বে হলেই তোমাদের যথার্থ জয় হবে। যে কাজে তোমরা প্রবৃত্ত হচ্ছ সেটা তোমাদেরই যথার্থ সৃষ্টিকার্য হয় এই আমার ইচ্ছা ; তোমরা তার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিমাণে অনুভব করবে— যখন মূর্তিটি গড়া হয়ে যাবে তখন তোমরা তার ভিতর নিজের জীবনের সাধনার প্রতিমূর্তি দেখতে পাবে। আমি কেবল তোমাদের ক্ষেত্র দিয়েছি এই পর্যন্ত— এবং যদি কখনো তোমরা আমাকে কোনো বিষয়ে তোমাদের সহযোগী করতে চাও তা হলে আমাকে পাবে।

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় হে—
ওহে বীর, হে নির্ভয়।

ইতি সোমবার

শান্তিনিকেতন

এই তো চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্তিতে আছে— এখনি তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল।

ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে হইবে— এখন পালে হাওয়া লাগিয়াছে— হু হু করিয়া চলিয়া যাও। কোনো বাধাই টিঁকিবে না। কিন্তু মনটাকে ঠাণ্ডা রাখিয়ো— উন্মাদনাও ভাল নয় অবসাদও ভাল নয়— যাহা ঘটিতেছে তুমি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র এ কথা মনে রাখিয়ো। আবার যদি গড়া জিনিস কখনো ভাঙে তখনো অবিচলিত থাকিতে হইবে। মনটাকে কাজের ক্ষেত্রের বহু ঊর্ধ্বে রাখিলে তবেই কাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। লেশমাত্র অহমিকা যেন তোমাকে না আক্রমণ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া কাজ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দের সঙ্গে তাহার সাহায্য করে। যেই তুমি বলিবে 'আমি করিতেছি' অমনি একলা পড়িবে।

—রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, তৎকালে বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র, মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখেন[৯]—

…বাঁকুড়ায় যাইব স্থির ছিল কিন্তু পতিসরে আমি যে পল্লীর কাজ ফাঁদিয়াছি সেখানে কাজের গোলমাল বাধিয়াছে। শীঘ্র না গেলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে। অতএব অভিনয়ের[১০] পরেই সেখানে ছুটিতে হইবে। দেরি যথেষ্ট হইয়াছে, আর করা চলিবে না। এইজন্যই বেনারস বাঁকুড়া দুই জায়গারই আহ্বান ফিরাইতে হইল।… ইতি ১০ই মাঘ ১৩২২

[কলিকাতা]

টম্‌সন সাহেব[১১] বিরক্ত হইতে পারেন, সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। কিন্তু তোমরা তো আমাকে জান, তোমরা কিজন্য আমাকে অনাবশ্যক টানাটানি করিবার ইচ্ছা করিতেছ? আমার যে বয়স ও যে অবস্থা, এখন আমার শক্তি সাবধানে ব্যয় করা দরকার। হাতে যে কাজ

পড়িয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে সেই কাজের ক্ষতি হয়; কেননা আমার শরীরের সামর্থ্য এখন পরিমিত। পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি— আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে কর্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্মচারীরা প্রজাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সময়ে আমি যদি অতি শীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার উপরে গ্রামে ওলাউঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে— আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহারও খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে। এ কথা মনে রাখিয়ো আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম— যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের নহে কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক— বাঁকুড়ায় যাওয়ার আবশ্যকতা সেজাতীয় নহে। অতএব আমার প্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তিকে আমি শিরোধার্য করিয়াই মঙ্গলবার দিনে পতিসরে চলিয়া যাইব।[১২] সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, নির্জন নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে— ইহার উপরেও তোমরা যদি সামান্য কারণে উপদ্রব করিতে চাও তবে তাহাতে আমার বোঝা বাড়াইয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে।

তোমরা আমাকে চেন, অতএব আমার উপরে এই বিশ্বাস স্থির রাখিয়ো যে, আমি দেহমনকে সামাজিক দায়িত্ব হইতে যেটুকু বাঁচাইয়া চলি তার কারণ আলস্য নয়, তার কারণ— আমার উপর কাজের ভার আছে, সে কাজ আমাকে নির্বাহ করিতেই হইবে। ইতি ১৩ মাঘ ১৩২২

—রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

জমিদারিতে এই পল্লীর কাজটিকে রবীন্দ্রনাথ কী দৃষ্টিতে দেখিতেন, বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে এই সময়ে লিখিত একখানি চিঠিতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে (১৩১৪) তিনি যে যুবকদের উপদেশ দিয়াছিলেন 'খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া' 'কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে', নিজেও সেইরূপ 'নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত' হন—

আপনার রিপোর্টে আমার নাম আর যে-কোনো আশয়ে ও উপলক্ষে ব্যবহার করুন, পল্লীর কাজটাকে বাদ দিবেন। আমার কাজকে আমি কোনোমতেই প্রচার করিতে চাই না— কারণ, আমি পাব্লিকের কাছে সাহায্য চাই না, খ্যাতিও চাই না, সুতরাং নিন্দাও না। আমার কাজ আমার গোপন কাজ— এ কাজ যাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছি তিনিই তাহার রিপোর্ট্ গ্রহণ করিবেন। এই পল্লীর কথা আপনি রিপোর্টে ব্যবহার করতে পারিবেন না।...

আর কিছু বলিবার নাই। মোট কথাটা, যে কাজ আমার জীবনের সাধনা তাহাকে বাহিরের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ধরা আমার সাধনার প্রতিকূল— তাহাতে কাজেরও ক্ষতি হয়, নিজেরও। এই-জন্যই, আপনি বিরক্ত হইবেন জানিয়াও এই বিষয়ে আপনাকে সম্মতি

দিতে পারিলাম না, কারণ বিষয়টি আমার পক্ষে বিশেষ গুরুতর। ইতি
১১ই চৈত্র ১৩২২

—পত্র

ইহার পরের পর্বে সুরুলের শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনবিভাগ-প্রতিষ্ঠা— ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২। শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ এই গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাষণে ব্যক্ত হইয়াছে; এই গ্রন্থের শেষে উল্লিখিত তিনখানি ইংরেজি গ্রন্থে ইহার কর্মবিবরণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠায়-সহযোগী শ্রীযুক্ত এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে এখানে উদ্‌ধৃত হইল, শ্রীনিকেতনের আদর্শ এগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে—

18 April 1923

The work in Surul is a work of creation, for in it you are not following some fixed path prescribed in books, but giving expression to your own creative personality, to which even the opposition of obdurate materials ultimately brings help for shaping the structure.

25 June 1924

I believe I have the power of vision which seeks its realization in some concrete form. Unless our different works in Visva-Bharati are luminous with the fire of vision, I myself can have no place in them. This is why all the time when Sriniketan has been struggling to grow into a form, I was intently wishing that it should not only have a shape but also light, so that it might transcend its immediate limits of time, space and some special

purpose ··· A lighted lamp is, for us, the end, and not a lump of gold.

—*pp 33-34*

The ideal which I cherish in my heart for the work I have been struggling to build up through the best portion of my mature life, does not need qualifications that are divided into compartments. It was not the Kingdom of the Expert in the midst of the inept and ignorant which we wanted to establish, although the expert's advice is valuable. The villages are waiting for the living touch of creative faith, and not for the cold aloofness of science which uses efficient machinery for extracting statistics, the statistics that deal with fragments of dissected life. I remember how you came fresh from your university and you were absurdly young but you were not in the least academic or aridly intellectual. With your instinctive humanity you came into the closest touch with the living being which is the village, and which is not a mere intellectual problem that could be solved through the help of arithmetical figures. I have personal experience of scientists who think that they know human facts, without taking the trouble to know the man himself. It is not for them to create and not even to construct, they never have done it, though they help. You had human sympathy in abundance, which was the principal motive power that carried you across all the difficulties that stood against you in their congregated might. You rightly named your work Village Reconstruction Work, for it was a living work comprehending

village life in all its various activities, and not merely productive of analytic knowledge.

A visitor may compare Sriniketan with other institutions of a similar nature in other big countries and, ashamed of the paltriness of our own efforts, may advise us to abandon it. This is like comparing the mothers of our country with those in the West, who possibly carry on their maternal duties more intelligently and with greater efficiency, and then to say that this mother business should be altogether given up in India. Yet mother love *does* work even in the East though not fully supplemented by medical science. The principal element is there. Similarly, the valuable gift of sympathy in some of our humble workers has worked a miracle, which must not be contemptuously mentioned becasue it has neither been measured nor acurately recorded.

The immense benefit realized by the surrounding villages through the constant inspiration of sympathy and encouragement of Sriniketan must never be belittled in favour of some impersonal abstractions of science, however valuable they may be. I, who am no scientist, set more value upon this human side of our service than anything which is academic. I can never believe that specialists are in their proper place at the head of the organizations, where constant co-ordination of human factors has to be made through personal contact and wisdom born of sympathy. The function of specialists, with their equipment for detailed analysis and statistics of facts, should be to serve the makers of history, those guides and lovers

of men who, possessing the gift of imaginative understanding, can vitalize knowledge and make it acceptable to others.

—*Rabindranath Tagore : Pioneer in Education*
pp 28-30

গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্র প্রভৃতি উদ্‌যোগ-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌কে এক চিঠিতে লিখিতেছেন—

19 December 1937

You know how for a long time I have been cherishing my hope of establishing an ideal centre of education at Sriniketan an ideal which is not curtailed to the strictest measure of a narrow village environment, which is not specially set apart to be doled out as a famine ration, carefully calculated to be just good enough for an emaciated life and a dwarfed mentality. It is well known that the education, which is prevalent in our country, is extremely meagre in the spread of its area and barren in its quality. Unfortunately this is all that is available for us, and the artificial standard set up is proudly considered as respectable Outside the *bhadralogue* class, pathetic in their struggle for fixing a university label on their name, there is a vast obscure multitude who cannot even dream of such a costly ambition. With them we have our best opportunity if we know how to use it. There, and there only, can we be free to offer to our country the best kind of all-round culture, not mutilated by official dictators. I have generally noticed that when the chari-

tably-minded, city-bred politicians talk of education for the village folk, they mean a little left-over in the bottom of their cup, after diluting it copiously. They are callously unmindful of the fact, that the kind and the amount of the food, that is needful for mental nourishment, must not be apportioned differently according to the social status of those that receive it.

I am therefore all the more keen that Siksha-Satra should justify the ideal I have entrusted to it, and should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects. Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation. Sriniketan should be able to provide for its pupils an atmosphere of rational thinking and behaviour which alone can save them from stupid bigotry and moralc owardliness. I myself attach much more significance to the educational possibilities of Siksha-Satra than to the school and college at Santiniketan, which are every day becoming more and more like so many schools aud colleges elsewhere in this country : borrowed cages that treat the students' minds as captive birds, whose sole human value is judged according to the mechanial repetition of lessons, prescribed by an educational dispensation foreign to the soil.

—*Rabindranath Tagore : Pioneer in Education*
pp 36-38

১৯৩০ সালে রাশিয়া-ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের মন পুনরায় বিশেষভাবে ভারতবর্ষের পল্লী-সমস্যার চিন্তায় মগ্ন হয়— 'গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই— কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি', 'আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে।' এই সময়ে যথাক্রমে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা দুখানি চিঠিতে, তাঁর প্রজাদের জন্য চিরদিন তাঁর মনে যে বেদনা ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে— 'মৃত্যুর আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?' আর বলিয়াছেন 'আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে'।—

··· ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষী প্রজাদের 'পরে আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা। বহু কাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রস্‌টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো, কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তা হলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি পারি নি বলে দুঃখ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে

লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?...

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোশাক আমাদের ছাড়তে হবে, নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য বিধান এই যে, এখন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে পারব। [১৯৩০]

—চিঠিপত্র ৩

... জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেক কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।...

এ দিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে, অনেক কিছু উলট-পালট হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল। সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো— তাতে দুঃখের ভার কমে যায়, বৃথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—

এখনি পাচ্ছে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয়, যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আলগা করে দিই— টানাটানি করতে গেলেই বাঁধন হয়ে ওঠে ফাঁসি।

··এটা খুব করে বুঝেছি, আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হত। যাই হোক, কিছু মাল-মসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি, দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে; তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেছে। ৩১ অক্টোবর ১৯৩০

—চিঠিপত্র ২

—

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত যে পত্র এই গ্রন্থের অন্যত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন— 'আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন- উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি।' সমবায়তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী 'সমবায়নীতি' পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নানা স্থানেও এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছে। 'উপায়' পত্রিকার প্রকাশকালে তাহার 'প্রস্তাবনা' রূপে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা পরপৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইল।—

'উপায়' পত্রিকার প্রস্তাবনা

'উপায়' এই শব্দটি শুনলেই প্রথমেই মনে হয় বাহিরের পন্থা। ছেলে পড়াশুনায় কাঁচা, পাস করে কী উপায়ে? নোট মুখস্থ করাও। মনে লোভ আছে, দ্বেষ আছে, শান্তি পাব কী উপায়ে? লোভীরা দ্বেষীরা একত্রে মিলে লীগ্ অফ্ নেশন্স্ ফাঁদলে শান্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের দেশে দুঃখ দৈন্য অপমানের প্রতিকার কী উপায়ে হবে এ প্রশ্ন যখনই জেগে ওঠে তখন মনে এই প্রত্যাশা থাকে যে, পথ বাইরে। অন্নকষ্ট হয়েছে? আচ্ছা, ভালো করে চাষ করো। অর্থকষ্ট হয়েছে? দেশসুদ্ধ সকলে মিলে চরকা চালাও। রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে? এমন ডাক্তার খুঁজে বের করো যাঁরা শহরে জীবিকার চেষ্টা ত্যাগ করে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করবেন।

কিন্তু আসল উপায় পথে নয়, পথে যে মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে। যে মানুষ চলতেই পারে না, পথ তাকে চালায় না। আমাদের দেশে যত-কিছু দুর্গতি আছে তার মূলগত কারণ হচ্ছে এখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলতে পারে না। রাস্তার ও পারে আগুন লাগলে এ পারের লোক যে দেশে ঘড়া লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়, পাছে সে ঘড়া নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের আগুন বাহিরের উপায়ে নিববে না, কেননা তার কপালে আগুন।

মালয় উপদ্বীপে গিয়ে দেখলুম সেখানে চীন থেকে যে-সব দরিদ্র লোক এসেছিল তারা প্রায় সকলেই সংগতিশালী হয়ে উঠেছে— তারা কেউ হীনবৃত্তি নিয়ে দীনভাবে থাকে না। কেননা তারা পরস্পরের আনুকূল্য করে। ভারতবর্ষীয় কুলির মধ্যে সেই পরস্পরের যোগ তো নেইই, বরঞ্চ তারা সুযোগ পেলেই পরস্পরকে শোষণ করতে থাকে। এই কারণে তারা পুরুষানুক্রমে কুলিই থেকে গেল।

পল্লীপ্রকৃতি

দেশের সকল অভাব সকল অপমানের মূল প্রতিকার হচ্ছে পরস্পরের ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হওয়া। আমাদের সমাজপ্রথার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবধানকে চিরন্তন করে রাখা হয়েছে। এমন-কি সেই ব্যবধানগুলিকে আমরা ধর্মানুশাসন বলেই গণ্য করি। এই কারণেই এক দিকে যখন আমরা বলি আমরা সনাতন ধর্ম মানি, তখনই অন্য দিকে উপায়ের বেলা বলতে হয় 'চরকা চালাও'। কিন্তু চরকার সুতোয় মানুষকে মেলাবে না। মানুষ না মিললে কোনো বাহ্য উপায়ে কোনো মহা বিপদ থেকে মানুষ ত্রাণ পাবে না। মানুষের সত্য হচ্ছে মানুষের মিলনে— যে দেশে মানুষের বিচ্ছেদকেই ধর্ম ব'লে স্বীকার করে, সে দেশকে দুর্গতি থেকে কোনো উপায়ে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

—কষ্টিপাথর। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১

সন্তোষবিহারী বসু শ্রীনিকেতনের অন্যতম কর্মী ছিলেন— তাঁহার রচিত সরল কৃষিশিক্ষা -বিষয়ক গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া, রবীন্দ্রনাথ চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু

যে আদর্শে আমাদের দেশে খেতের কাজ হওয়া উচিত, আমি জানি সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। কৃষিকার্যে নূতন জ্ঞান ও নূতন চিন্তা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। যদি জড় প্রথার উপর বরাত দিয়া উদাসীন থাকি তবে আধুনিক কালের দাবি রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। পূর্বকালে আমাদের গ্রামের হাটই ছিল আমাদের ফসলের হাট, আমাদের ফল ফলাইবার চেষ্টা সেই সংকীর্ণ পরিধির উপযুক্ত

ছিল। এখন বিশ্বের হাটে আমাদের চাষীদের তলব পড়িয়াছে, জোগান দিতে কুলায় না। বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগে আমাদের গৃহস্থদের প্রয়োজনের পরিমাণ যতটা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়াছে, অথচ উৎপাদনের উপায়গুলি পূর্ববৎ, এবং উৎপাদনের শক্তিও বাড়ে নাই। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এমন সাংঘাতিক দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। কৃষিজীবী দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার উদ্‌বৃত্তসঞ্চয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বাহিরের হাটে মূল্যের পতন, আকস্মিক উৎপাত মাঝে মাঝে অনিবার্য। সে স্থলে পূর্বসঞ্চিত সম্বল হাতে না থাকিলে দল বাঁধিয়া নিরুপায়ে মরিতে হয়। সেই দারুণ দৃশ্য প্রায়ই আমাদের চোখে পড়িতেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে চাষীর বিপদ কেবল যে নৈমিত্তিক তাহা বলিতে পারি না, তাহা নিত্য। টানাটানি প্রতিদিনই চলিতেছে। তাই উদ্‌বৃত্ত দূরে থাক্, ঋণের দায়ই বাড়িয়া চলিয়াছে, বর্তমানের দায়ে তাহাদের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল। চাষী ছাড়া আমরা অন্য যাহারা আছি, বাক্য ছাড়া কোনোপ্রকার উৎপাদনের প্রায় কিছুই করিতেছি না। সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরে চাষী যাহা ফলাইতেছে, উপরিস্তরের লোক নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাদেরই সেই ফসলের ভাগ লইতেছে, দেশের অল্প ধন নিয়ত গ্রহণ করিতেছে, তাহার পরিবর্তে কোনো ধন দেশকে ফিরাইয়া দিতেছে না।

সেই উপরিতন লোকদের কথা এখন থাক্। চাষীদের হাতে যাহাতে উদ্‌বৃত্তসঞ্চয় থাকে আশু তাহার উপায় করা উচিত— অন্যান্য সকল সমস্যার চেয়ে এটা বড়ো বৈ ছোটো নয়। এই উদ্‌বৃত্তসঞ্চয় হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্য, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের ধর্মকর্ম, তাহাদের উৎসব সম্ভবপর। সে সঞ্চয় যদি না থাকে তবে তাহারা মূঢ়তা, অস্বাস্থ্য, অপমান ও নিরানন্দের মধ্যে কেবলই তলাইতে থাকিবে ও তাহার ফলে তাহাদের

প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহাদের কর্মকে মূল্যহীন ও স্বল্পফল করিয়া তুলিবে। যত লোক দেশে বাস করিতেছে নানা কারণে তাহাদের শক্তি যদি অল্প হয়, তবে তাহাদের সংখ্যাধিক্যে ব্যয় যত বাড়িবে আয় তত বাড়িবে না— সুতরাং দারিদ্র্যের দুঃখই কেবল বাড়িয়া চলিবে। এ কথা ভুলিলে বিপদ যে, উদ্‌বৃত্ত অন্নই আমাদের শক্তির পরিচয় ও শক্তির আশ্রয়, এই শক্তিই সকল সভ্যতার মূল।

আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ফসল-ফলানোর ব্যাপার কেবলমাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনপটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন। যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবা-মাত্র আশ্চর্য সফলতা ঘটিয়াছে। তাই আমাদের দেশের কৃষির পশু ও কৃষিফলের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে আমাদের মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার বিধিনির্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যু, সেই শাস্তি স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে একটুও লাগিল না। উপবাসে মরিতে মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাকিবে ; স্বচেষ্টায় তাহার উন্নতি করিতে পারি এ শ্রদ্ধা নিজের উপর নাই— তাই জীর্ণ সাবেক কালকে দিয়া বর্তমান কালের বিপুল দায় মিটাইবার তাড়ায় প্রাণ বাহির হইল।

পলিটিক্‌স্‌-প্রমত্ত দেশের এই অপরিসীম জড়তা সত্ত্বেও যাঁহারা সাধ্য-মতে কৃষিসাধারণের উন্নতিকল্পে কাজে লাগিয়াছেন— তাঁহাদের মধ্যে সন্তোষবিহারী একজন। অনেক দিন হাতে কাজ করিয়াছেন, এখন হাতে-কলমে কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত। কৃষিশিক্ষা-প্রচারের উপযোগী একখানি পাঠ্য গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন— এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন যে গুরুতর তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত নহে এবং এরূপ গ্রন্থ লিখিবার উপযুক্ত ব্যক্তি যে তিনি তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

—প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৫

প্রসঙ্গপরিচয়

সভাপতির অভিভাষণ। পাবনা সম্মিলনী।

বিশেষভাবে বাংলাদেশের সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য একটি প্রাদেশিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা হয় ১৮৮৮ সাল হইতে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রিক চেতনার উদ্‌বোধনে এই সম্মিলনীর দান অসামান্য— এই সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতেই বাংলাদেশের মনস্বিপ্রধানগণ সুদীর্ঘকাল নিজ নিজ বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন— স্বদেশী যুগে এই সম্মিলনীরই 'বঙ্গভঙ্গ' হইয়া দেশময় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। স্বদেশীসমাজ প্রবন্ধে (১৩১১) এই কন্‌ফারেন্‌স্‌-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'এ কনফারেন্‌স্‌ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি— আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না।... ... দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে ... দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্‌ কোন্‌ পথ চিরদিন খোলা আছে সেইগুলি দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্‌স্‌কে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা মেলা করিতাম। ... আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।'

ইতিপূর্বে সম্মিলনীর রাজশাহি ও ঢাকা অধিবেশনে[১৩] রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ও অংশত কৃতকার্য হইয়াছিলেন ; পাবনায় (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সভাপতির বক্তৃতা তিনি বাংলাতেই রচনা ও পাঠ করিলেন। আর 'দেশের যথার্থ কাছে যাইবার পথ' কী তাহার আলোচনা করিলেন।[১৪]

কর্মযজ্ঞ। পল্লীর উন্নতি

বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথের দুইটি বক্তৃতা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে— 'কর্মযজ্ঞ' ও 'পল্লীর উন্নতি'। এই প্রসঙ্গে উক্ত মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া গেল—

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশীতিতম উৎসব উপলক্ষে [কলিকাতা] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১২ই মাঘ ১৩২১ (২৬শে জানুয়ারি ১৯১৫) একটি আলোচনা-সভা আহূত হয়। বিষয় 'প্রচার ও সেবা'। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনার অবতারণা করেন ·· প্রস্তাবিত হয় যে, লোকহিতসাধন বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য ; ইহার অনুষ্ঠান এখনই এই স্থানে আরম্ভ হউক··· আর সভায় যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদিগকে লইয়া জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একটি মণ্ডলী গঠিত করিয়া কার্যারম্ভ হইবে। এইরূপে সর্বপ্রথমে বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলী গঠিত হয়। ইহার পর জনসাধারণের অবগতি ও এই কার্যে তাঁহাদের যোগদান প্রার্থনা করিবার জন্য একটি উদ্‌বোধন-সভা আহূত হয়। তাহার নিমন্ত্রণ-পত্র এইরূপ—

'··· আগামী ১লা ফাল্গুন ১৩২১ (১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি প্রারম্ভিক সভা আহূত হইয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করিবেন।... 'দ্বাদশ শতাধিক লোক... এই সভায় যোগদান করেন।'

এই-সকল বক্তৃতা মণ্ডলী-কর্তৃক প্রকাশিত 'উদ্বোধন' নামক পুস্তকে সংকলিত হয়, 'কর্মযজ্ঞ'ও তাহার অন্তর্গত। উপরে মুদ্রিত বিবরণও ওই পুস্তিকা হইতে গৃহীত। 'পল্লীর উন্নতি' কথিত হয় ২৮ মার্চ্ ১৯১৫ তারিখে বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীর সভায়।

৭ মার্চ্ [১৯১৫] তারিখে বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীর সভ্যগণের একটি সাধারণ সভায় রবীন্দ্রনাথ এই মণ্ডলীর সহকারী সভাপতি মনোনীত হন— অন্যান্য সহকারী সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রাসবিহারী ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সভাপতি— বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহ্‌তাব। বাংলাদেশের প্রধান ব্যক্তি প্রায় সকলেই নানা ভাবে এই মণ্ডলীর সহিত যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ পরে (১৯২৪-৩০) এই মণ্ডলীর সভাপতি-পদেও বৃত হইয়াছিলেন।

ভূমিলক্ষ্মী

'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনা প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩২৫ কষ্টিপাথর বিভাগ হইতে সংকলিত।

অভিভাষণ

১৩৪৫ সালের ২২ অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভবনে শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের উদ্‌বোধন করেন সুভাষচন্দ্র বসু, এই উপলক্ষে পঠিত রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত অভিভাষণ। তিনি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিভাষণে, 'তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান' বা 'তোমরা স্বদেশের প্রতীক' এই উক্তির লক্ষ্য কন্‌গ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র।

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত বর্তমান ভাষণে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছেন কালীমোহন ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ ও শ্রীযুক্ত এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট্।

হলকর্ষণ

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত একখানি চিঠি এই অভিভাষণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

আজ স্রুলে হলচালন উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্র-যোগে কাজটা করতে হবে ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাল-লাঙল কাঁধে করে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে। বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল-লাঙলের উদ্‌ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে খাদ্য উদ্ধার করে; মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র-উদ্‌ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর কর্মে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় বলে থাকি— dignity of labour, অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা বলেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল-লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্‌ভাবন-কৌশলের

আদিম প্রকাশ ব'লে। সেইখানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তা হলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে— আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে— সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই বলে আক্ষেপ করছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে, তাতে করে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধি ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি— কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে— একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬

—পথে ও পথের প্রান্তে

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে মুদ্রিত অপর সকল রচনাই শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারি) বা হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে কথিত ভাষণের অনুলিপি। 'পল্লীপ্রকৃতি', অনুরূপ অনুলিপি অবলম্বনে কবি-কর্তৃক

পরিবর্ধিত আকারে লিখিত হয় (মুদ্রণকালে আরও পরিবর্তন হয়)— সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে অষ্টম ও শেষ পৃষ্ঠার উনীকৃত প্রতিলিপি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল।

অভিভাষণ

কলিকাতায় বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত এল. কে. এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ Robbery of the Soil[১৫] সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, এই সভার সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ।

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ

'বিশ্বভারতী সম্মিলনী ও অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে ২৯শে আগস্ট [১৯২৩] তারিখে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি গৃহে আহূত সভায় সভাপতির বক্তৃতা।' 'সংহতি'-সম্পাদক মুরলীধর বসু অনুগ্রহপূর্বক এই বক্তৃতার প্রতিলিপি 'সংহতি' হইতে আমাদের দেন ; তিনি আমাদের জানাইয়াছিলেন যে, এই অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত।

ম্যালেরিয়া

'অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা। অ্যাল্‌ফ্রেড থিয়েটার হল। ২৩।২। [১৯] ২৪।' অনুলিপি-পাঠে মনে হয় যে উহা বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত নহে। তৎসত্ত্বেও প্রসঙ্গানুরোধে যৎসামান্য আক্ষরিক সংশোধনে পুনর্মুদ্রিত হইল। বর্তমান প্রসঙ্গে 'সমাধান' প্রবন্ধের (১৩৩০) অংশবিশেষ উদ্‌ধৃতি-যোগ্য—

সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেছে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।— বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের অভাব, এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমন প্রকৃতির কাজ এমন ধরণে করতে পারব যা এখন পারি নে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি— কিন্তু সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে? অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে উঠলেন, দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড়ো কথা বলবার ভরসাকেই তো আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরু-মানা অবতার-মানা দেশে এত বড়ো বুকের পাটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটি-মাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হল।

স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত-দ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মতো প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জের জন্যে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পিলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতি-সাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এতে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুনতি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে যায়। স্বরাজ বলো, সভ্যতা বলো, মানুষের যা-কিছু মূল্যবান ঐশ্বর্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক-না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই ব'লেই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষেব ত্রিশ কোটি মানুষের মন পরিমাণ হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার, এই অবুদ্ধির, জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না, এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে এই আমাদের কাজ। এ কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যাঁরা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, সত্যতা থেকে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিতে পারেন।[১৬]

প্রতিভাষণ

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গভ্রমণে যান, এই সময় ময়মনসিংহেও গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল তাহার উত্তর।

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

এই প্রবন্ধ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধক্রমে রচিত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এই সংবাদ দিয়াছেন। 'বাংলার তাঁতি' নামে এই প্রবন্ধ ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'তেও প্রকাশিত হইয়াছিল। মোহিনী মিল -কর্তৃক প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়।

শিক্ষার বিকিরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৩৩। এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত, সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বর্তমানে 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত।

জলোৎসর্গ

'এবারকার বর্ষামঙ্গলে একটু নূতনত্ব ছিল। চিরপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে [৭ ভাদ্র ১৩৪৩]। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটিকে খনন ক'রে নির্মল জলের সম্বল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয়-প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়, তাই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই

উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়।… সর্বশেষে কবি… নব-উৎসারিত জলকে অভিনন্দিত ক'রে একটি অভিভাষণ দ্বারা উৎসবকে সুসম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত করলেন।'' [১৭]

সম্ভাষণ

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসর' শান্তিনিকেতনে এক অধিবেশনে সমবেত হন, তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহার অনুলিপির একাংশ।

অভিভাষণ

১৩৪৬ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় যান। জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে এই ভাষণ।

পত্রাবলী

এই গ্রন্থে যে পাঁচখানি চিঠি হইতে কতক কতক অংশ সংকলিত সেগুলি—
১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ
২ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ
৪ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (?) ও
৫ শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তীকে

লেখা হইয়াছিল। বর্তমান পত্রগুচ্ছের ২ ও ৩ -সংখ্যক পত্র যথাক্রমে 'রাশিয়ার চিঠি'র ১ ও ৪ -সংখ্যক চিঠির অংশ এবং ৪ -সংখ্যক পত্র 'রাশিয়ার চিঠি'রই উপসংহারের অঙ্গীভূত। ১৮৬ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ 'প্রবাসী' হইতে সংকলিত।

প্রসঙ্গপরিচয়

এই গ্রন্থে সংকলিত অনেকগুলি রচনাই বক্তৃতার অনুলিপি, অধিকাংশ স্থলে কবি-কর্তৃক সংশোধিত— কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সে কথা সাময়িক পত্রে উল্লিখিত ; অপর কোনো-কোনো স্থলে তাহা অনুমান করা যায়। তবে কতক সংকলন যে যথোচিত অথবা সংশোধিত অনুলিপি নহে ; তাহাও সহজেই বুঝা যায়— বিষয়গুণে এগুলিও রক্ষিত হইল।

রচনাশেষে ভাষণের (বা রচনার) তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তবে বহু ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল মুদ্রিত হইয়াছে— প্রসঙ্গপরিচয় হইতে ভাষণের (বা রচনার) তারিখ জানা যাইবে।

সংকলনকালে বানান প্রভৃতি বিষয়ে সমুদয় রচনার মধ্যে কথঞ্চিৎ সংগতি রক্ষার যত্ন করা হইয়াছে।

সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচী

এই গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ রচনা ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই, সাময়িক পত্রে নিবদ্ধ ছিল। যে-সকল সাময়িক পত্রে এগুলি প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহার সূচী মুদ্রিত হইল।

সভাপতির অভিভাষণ[১৮]	বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন ১৩১৪
কর্মযজ্ঞ	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
পল্লীর উন্নতি	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২২
ভূমিলক্ষ্মী	ভূমিলক্ষ্মী। আশ্বিন ১৩২৫
শ্রীনিকেতন	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
পল্লীপ্রকৃতি[১৯]	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৩৫
পল্লীসেবা	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৩৭
গ্রামবাসীদের প্রতি	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৭
দেশের কাজ[১৯]	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৮
উপেক্ষিতা পল্লী	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪০
অরণ্যদেবতা	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৫
[১৯]অভিভাষণ[২০]	বিচিত্রা। পৌষ ১৩৪৫
শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৬
হলকর্ষণ	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৬
পল্লীসেবা	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪৬

॥ ২ ॥

অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন পত্র। ১৩২৯
সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ	সংহতি। ভাদ্র ১৩৩০

ম্যালেরিয়া	বঙ্গবাণী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
প্রতিভাষণ[২১]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৩
বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৮
শিক্ষার বিকিরণ	[পুস্তিকা। ১৯৩৩]
জলোৎসর্গ[২২]	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৩
সম্ভাষণ[২৩]	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪৩
কবির উত্তর	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭

॥ ৩ ॥

১	দেশ। ৩০ বৈশাখ ১৩৬৮
২	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
৩	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৩৭
৪	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৮
৫	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

গ্রন্থপরিচয়ে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার কোনো-কোনোটি সংকলয়িতার লক্ষগোচর করিয়াছেন শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীপার্থ বসু, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কার-উদ্‌যোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই-সকল গ্রন্থে প্রাপ্তব্য—

Prem Chand Lal : *Reconstruction and Education in Rural India* : George Allen & Unwin, 1932.

Sudhir Sen : *Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction* : Visva-Bharati, 1943.

Rabindranath Tagore : *Pioneer in Education* : Essays and Exchanges between Rabindranath Tagore and L. K. Elmherst : John Murray, 1961.

Rathindranath Tagore : 'Father as I knew him', *Rabindranath Tagore, 1861-1961*, A Centenary Volume : Sahitya Akademi, 1961.

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী।

শ্রীসজনীকান্ত দাস -প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ' প্রবন্ধ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী -প্রণীত 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে' প্রভৃতি গ্রন্থে শিলাইদহবাস-কালে রবীন্দ্রনাথের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

॥ সংশোধন ॥

পৃ ৫৬, শেষ ছত্র : ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

পৃ ৭৪, 'দেশের কাজ' পঠিত নহে, কথিত

৭.১০২ ১ এই অনুচ্ছেদে উদ্‌ধৃতাংশ রবীন্দ্রনাথের 'হাতে কলমে' প্রবন্ধের অন্তর্গত। এই প্রবন্ধ ১২৯১ সালের ১১ ভাদ্র (১৮৮৪) সাবিত্রী-সভার ষষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত হয়। ভারতী ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১। অপিচ 'সাবিত্রী' গ্রন্থ, পিপেল্‌স্ লাইব্রেরি, ১২৯৩।

২১০. ২ উল্লেখ করা হইয়াছে, 'চিত্রা' কাব্যের এই কবিতার রচনা ১৩০০ বঙ্গাব্দে। এখানে রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি গান বা কবিতাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, যেমন 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১০৭, ১০৮ ও ১১৯ -সংখ্যক রচনা (সবগুলি ১৩১৬ আষাঢ়ে রচিত)—

১) যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন

২) হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান

৩) ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ প'ড়ে

তাহা ছাড়া কবিজীবনের সীমান্তে আসিয়া একই ভাবনা-বেদনার নূতন এক প্রকাশ হিসাবে 'জন্মদিনে' কাব্যের ১০-সংখ্যক এবং 'আরোগ্য' কাব্যেরও ১০-সংখ্যক কবিতা-দুটি (রচনা যথাক্রমে ২১ জানুয়ারি এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১) —

৪) বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি

৫) অলসসময়ধারা বেয়ে।

কবি যে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে, দরদের সঙ্গে, চিরদিন দেশের বিপুল জনসাধারণের কথা ভাবিয়াছেন— কৃষক শ্রমিক সকলের সহিত একাত্ম হইবার কামনা করিয়াছেন— তাহাদের উদ্দেশে অন্তরে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করিয়াছেন— সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই-সকল রচনাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।

২১৪ ৩ Sudhir Sen, *Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction* (1943) গ্রন্থে "Gora" অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

গোরা উপন্যাসে প্রজাদের দুর্গতির যে-সকল বিবরণ আছে সে প্রসঙ্গে এই বিবরণটি উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

তখন শিলাইদহে ছিলুম। সেখানকার জেলেদের আমি ভালোরকম করেই জানতুম। তাদের জীবিকা জলের উপর। ডাঙার অধিকার যেমন পাকা, জলের অধিকার তেমন নয়। জলের মালেকরা তাদের উপর যেমন-তেমন অত্যাচার করতে পারত; এই হিসাবে চাষীদের চেয়েও জেলেরা অসহায়। একবার জলকরের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে কোনো নৌকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ তুলে নিল নিজের ডিঙিতে। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটত।

অন্যায় সহ্য করে যাওয়াই যার পক্ষে বাঁচবার সহজ উপায় এইবার সে সইতে পারল না, দিলে সেই কর্মচারীর কান কেটে। তার পরে রাত্রি তখন দু'পহর হবে, জেলেদের কাছ থেকে আমার বোটে লোক এল; বললে, সমস্ত জেলেপাড়ায় পুলিস লেগেছে। বললে, কঠোর আচরণ থেকে আমাদের মেয়েদের ছেলেদের রক্ষা করুন। তখনি একটি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলুম। সরকারি কাজে বাধা দেবার জন্যে নয়, কেবল উপস্থিত থাকবার জন্যে। তার অন্য শক্তি নেই, কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের আদর্শ আছে। উপস্থিতি-দ্বারা সেই আদর্শকে প্রকাশ করেই অন্যায়ের সে প্রতিবাদ করতে পারবে।

—"প্রচলিত দণ্ডনীতি", প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৪। কালান্তর (১৩৬৭)

২১৮ ৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩ (বিশ্বভারতী)

২১৮ ৫ 'শিক্ষা' গ্রন্থ-ভুক্ত।

২২১ ৬ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রচনার (১৯০৪) পরে, বা পাবনা সম্মিলনীর (১৯০৮) সমকালে তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই, তবে ইহা এই পর্বে প্রচারিত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। মূল পুস্তিকাটি দেখি নাই। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার 'কংগ্রেস' গ্রন্থে ইহা মুদ্রণ করেন, তথা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

২৪৪ ৭ চাষবাসের উন্নতিচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ উৎসুক ছিলেন সেই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠিও দ্রষ্টব্য—

[শান্তিনিকেতন]

যদু সরকার (পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক) এসেছেন— তিনি আমাকে বলছিলেন, গয়ায় খানিকটা জমি ফসল হত না বলে পড়ে ছিল— শিবপুরের একজন ছাত্র মাটি পরীক্ষা করে সেখানে খেঁসারির ডাল চাষ করাতে প্রচুর খেঁসারি হয়েছে— এখন তার চারিপাশের চাষারা তাদের পতিত খারাপ জমিতে খেঁসারি দিয়ে খুব লাভ করচে— তোদের ওখানে জমির জন্যে ত ভাবনা নেই— খারাপ জমি উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। যেখানে জলের অত্যন্ত অভাব সেখানকার জন্যে অষ্ট্রেলিয়ার কি একটা গাছ লাগিয়ে ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও বিশেষ ফল পাওয়া গেছে— সেই গাছ গোরুর খাদ্য। গাছটা কি জানলে বোলপুরের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। [১৯১০]

— চিঠিপত্র ২

২৪৭ ৮ রবীন্দ্রায়ণ দ্বিতীয় খণ্ডে এই পত্রের যতটা উদ্‌ধৃত, মূলানুযায়ী তাহার অতিরিক্ত কয়েকছত্র এ স্থলে সংকলিত।

২৬০ ৯ দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ', শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, অথবা শ্রীসজনীকান্ত দাস -প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য'।

" ১০ কলিকাতায় ফাল্গুনী-অভিনয়, ১৩২২ মাঘ, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-নিবারণের সাহায্যে। অভিনয়লব্ধ অর্থ বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীর ভাণ্ডারে অর্পিত হয়।

" ১১ রবীন্দ্র-চরিতকার এডওয়ার্ড টম্সন, তৎকালে বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ।

২৬১ ১২ যথাক্রমে পতিসর ও শিলাইদহ হইতে এই সময়ে (ফেব্রুয়ারি ১৯১৬) প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত দুইটি চিঠির অংশ—

এবারে আমার শরীর অত্যন্ত বেশি অবসন্ন ছিল।··· কিন্তু পতিসরের সেই পল্লীসংস্কারের কাজটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে, অন্তত তাকে একটা পিণ্ডি না দিয়ে ফিরতে পারছি নে। —চিঠিপত্র ৫, পৃ ২০৮-০৯

এখানে চুঁয়োপাড়ার প্রজারা বিষম কান্নাকাটি করছে। দূরে থাকলে প্রজাদের দুঃখ আমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না— যেটা পৌঁছয় সে হচ্ছে খাজনা। দূরে থাকার অন্যায় হচ্ছে এই। যাই হোক, ১৪৫ ধারায় এদের চাষের জমি, এদের ফসল প্রভৃতি আবদ্ধ হয়ে এরা যে কষ্টে পড়েছে তার কী উপায় হতে পারে ভেবে দেখো।··· চুঁয়োপাড়ার প্রজাদের নিয়ে আমার মনটা বড়োই ক্লিষ্ট হয়ে আছে। ডেপুটির এজলাসে যদি কোনো ভালো উকিল কৌঁসুলি পাঠিয়ে ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হলে সে চেষ্টা দেখা উচিত।

—চিঠিপত্র ৫, পৃ ২০৭

২৭৫ ১৩ তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহি-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।··· পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা-কন্ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। —'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর

২৭৬ ১৪ এই অভিভাষণ সম্বন্ধে অবলা বসু রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা পরপৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত—

[লণ্ডন] ২০ মার্চ ১৯০৮

…যাহাকে এত যত্নে ও স্নেহে বর্ধিত করিয়াছিলেন সে [কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ] সব আশা চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া মায়ের কোলে গেল ; আপনি মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা দেশের কার্যে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কী বলিতে পারি— আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হই, জন্মভূমি ধন্য হোক। প্রাদেশিক অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সংকটের সময় দেশবাসী সকলকে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন, কারণ শুনিতে পাই যে অন্যদেশীয় দেশভক্তরা নাকি বাঙ্গালীর আবার একতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছে… আপনি কিন্তু বরাবর পৃথক হইয়া থাকিবেন এবং এখন যেমন কাজ করিতেছেন তেমনি করিবেন।…আপনি সভাভঙ্গে কী বলিয়াছিলেন তাহা কোনো কাগজেই দেখিলাম না, শুনিতে পাই তাহা খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

—জগদীশচন্দ্র বসু : পত্রাবলী

২৮০ ১৫ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কৃত অনুবাদ, 'মাটির উপর দস্যুবৃত্তি', শান্তিনিকেতন পত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

২৮২ ১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ (বিশ্বভারতী), গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৪৯৬-৯৭

২৮৪ ১৭ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩। এই প্রবন্ধে এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণে যে 'জলোৎসর্গ'-মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার অভিভাষণের সহিত ঐ সংখ্যা প্রবাসীতে তাহাও প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তের 'রবিচ্ছবি' (১৩৬৮) গ্রন্থে বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২৮৬ ১৮ সভাস্থলে বিতরণার্থ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত, পরে সাময়িক পত্রে পুনর্মুদ্রিত।

" ১৯ পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

" ২০ 'শ্রীনিকেতন' নামে।

২৮৭ ২১ 'পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা' নামে মুদ্রিত।

" ২২ 'অভিভাষণ' নামে মুদ্রিত।

" ২৩ 'রবি-বাসরের অভিভাষণ' নামে মুদ্রিত।